KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200[illegible]	Place of Publication : 34/2 Mohim Haldar St. Cal-26
Collection : KLMLGK	Publisher : Dhira Bhattacharya
Title : অনুরাগ (ANURAAG)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 13 15 17 22	Year of Publication : Jan 1998 Sep 1998 May 1999 Jan 2001
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : Dhira Bhattacharya	Remarks

C.D. Roll No : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
* কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

বইমেলা

অনুরাগ...

সাহিত্য-চাতুর্মাস্য

দ্বাবিংশ সঙ্কলন, মাঘ ১৪০৭

প্রতিষ্ঠাতা : বিশ্বনাথ ঘোষ সর্বাধ্যক্ষ : শান্তি রায়
পৃষ্ঠপোষক : দীপালী চৌধুরী, মীনা বসু, বিউটি মজুমদার, অপরেশ সেন।

অনুরাগ

সাহিত্য-চাতুর্মাস্য

দ্বাবিংশ সংকলন : মাঘ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি, ২০০১

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উপদেষ্টা প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদক : ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী। অর্চিতা রায় চৌধুরী, জয়ন্তী সান্যাল,

সাংগঠনিক প্রধান : ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন

৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০২৬

বইমেলা 'অনুরাগ' সাহিত্য-চাতুর্মাস্য

দ্বাবিংশ সংকলন   মাঘ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

সূচীপত্র

রাগানুগ

অষ্টম বর্ষ পৃঃ ৩

অনুরাগের নিবেদন পৃঃ ৪

প্রবন্ধ রম্যরচনা বিবিধ পৃষ্ঠা ৫—৩৪

বিশ্বনাথ ঘোষ, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, পিয়া চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশিস গুহ।

কাহিনী-কাব্যানুবাদ পৃঃ ৩৫

ধরিত্রী চক্রবর্তী

গল্প উপন্যাস পৃঃ ৪১—৮০

লীনা সেন, কণা সেনগুপ্ত, দীপালী সরকার, সুশীলচন্দ্র দাস, দেবশ্রী দাস, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিভট্ট।

কবিতা ছড়া পৃঃ ৮১—৯৪

বলরাম বসাক, সনৎ কুমার মিত্র, ওমর আলী, মাধুরী সিংহ, আনজু বানু, স্মরণ দত্ত, মঞ্জরী সিংহ, অমিতাভ কর্মকার, নিতাই দত্ত, বন্দনা বসু, অর্চিতা রায় চৌধুরী, নির্মল তালুকদার, বিশ্বনাথ সাহা রায়, সুপতি ঘোষাল, অনাদি সেন, পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, রূপম সাহা রতন।

প্রাপ্তিস্বীকার পৃঃ ১৫, ৩০, ৪০, ৫১।

সাহিত্য সভা পৃঃ ৯৭   শোকসংবাদ পৃঃ ৯৯

পুস্তক পরিচয় পৃঃ ৯৫

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ক্যাসেট পরিচিতিঃ শিখা গোস্বামী পৃঃ ৯৮

সত্য প্রেস, ১০/২এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

দশ টাকা

অষ্টম বর্ষ

'অনুরাগ' আট-এ পা রাখল। যেসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বয়স আটের কম, তাদের কাছে এটা নিশ্চয় রোমাঞ্চকর খবর। অনেকের মতে, লিট্‌ল ম্যাগাজিন দশ বছর চললেই যথেষ্ট, তার বেশি চললে লিট্‌ল ম্যাগের পরিপূর্ণ চরিত্র বজায় রাখা কঠিন। আমরা এসব বিতর্কে জড়াতে চাইনা। তবু বলতে ইচ্ছা করে, আর দু বছর পরেই ঘোষণা করা যাবে, কেল্লা ফতে।

আমাদের অনুরাগের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ ঘোষ ১০।১০।২০০০ তারিখে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, 'শারদীয় অনুরাগ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই খুব প্রশংসা করেছেন। এতে আনন্দিত হয়েছি।'

পঞ্চাশ দশকের বিশিষ্ট কবি, ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমনীর সুনাম শুনেছি' কাব্য-খ্যাত ১৯৮১ ঢাকা বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৯১ আলাওল পুরস্কার ভূষিত কবি অধ্যাপক ওমর আলী বাংলাদেশের পাবনা থেকে ২২।৬।২০০০ তারিখের পত্রে লিখেছেন, 'আদাব নিন। অনুরাগ বৈশাখ ও বইমেলা সংখ্যা এবং Saint Poet Adityakumar and his works পেয়েছি। অনেকগুলো লেখা এক সঙ্গে পাঠালাম। পর্যায়ক্রমে ছাপবেন ও পত্রিকা পাঠাবেন। অনুরাগ আমার প্রিয় পত্রিকা। কাজেই যদি আপনাদের আর্থিক ক্ষতি কিছুটা হয়ও তবু দয়া করে পাঠাবেন। আমিও যতদিন বেঁচে থাকি অনুরাগে লিখবো। ইতি

বিনয়াবনত

ওমর আলী।'

সাহিত্য-চাতুর্মাস্য 'অনুরাগ'-এর এই সব বান্ধবদের কথা আমরা ভুলব কেমন করে? তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব পত্রিকা চালিয়ে যেতে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পরিচালকদের নানাবিধ অসুবিধার কথা, এর সঙ্গে জড়িত সকলেরই বিলক্ষণ জানা আছে। কাজেই সেসব কথা আর সাত কাহন করে বলার কোন দরকার নেই।

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার প্রতি 'অনুরাগ' দায়বদ্ধ। সে তার সাধ্যমত সাহিত্যের সর্ব শাখার আলোচনা রচনা ও চর্চা চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুত। আমরা

সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা পরিবেশন করতে পারব তেমন স্পর্ধা প্রকাশ করতে চাই না। কিন্তু আমাদের সাহিত্যচর্চা যে আন্তরিক, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এবারের পয়লা জানুয়ারী থেকে তৃতীয় সহস্রাব্দ শুরু হল। আমরা এই নতুন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাই। মনুষ্যজাতির সুখ, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রগতি এগিয়ে চলুক, এই কামনা।

অনুরাগের নিবেদন

'অনুরাগ' বছরে তিনটি সঙ্কলন প্রকাশ করে। বইমেলা, পঁচিশে বৈশাখ, শারদীয়। জানুয়ারি, মে, সেপ্টেম্বরে।

আপনার শ্রেষ্ঠ ছোট লেখাটি অনুরাগের জন্য পাঠাবেন। জেরক্স কপি চলবে না। কাগজের এক পিঠে লিখবেন।

প্রতি ইং মাসের তৃতীয় শনিবারে সন্ধ্যায় সাহিত্য সভা বসে। সম্পাদকের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা, তখনই করতে হবে। অন্য সময় তাঁকে পাওয়া যাবে না।

তখন—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৩৫ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

অনুরাগের সদস্য হবার জন্য বছরে ১২০ টাকা শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্যের নামে পাঠাবেন।

বিজ্ঞাপন দিয়েও অনুরাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন। ডাক খরচা অনেক বেড়ে গেছে, তাই সদস্য হয়েই লেখা পাঠাবেন। নতুবা যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না।

'অনুরাগ'-এর বিজ্ঞাপনের হার

প্রচ্ছদ শেষ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
,, দ্বিতীয় ,,	৪০০ ,,
,, তৃতীয় ,,	৩০০ ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০ ,,
,, অর্ধ ,,	১২০ ,,
,, এক-চতুর্থ পৃষ্ঠা	৭০ ,,

মন্ত্রীমশাই বিশ্বনাথ ঘোষ

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন জহরলাল নেহরু। জন্ম ১৪-১১-১৮৮৯, মৃত্যু ২৭-৫-১৯৬৬, ৭৫ বছর বেঁচে-ছিলেন। তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী, পণ্ডিত আর লোভী।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। জন্ম ১৯০৪ মৃত্যু নবেম্বর ১৯৬৪, ষাট বছর বেঁচেছেন। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, নির্ভীক, চাপা প্রতিভা। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয় করেছেন এবং মরণ বরণ করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধী তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী। জন্ম ১৪-১১-১৯১৭ মৃত্যু ৩১-১০-১৯৮৪, ৬৭ বৎসর বেঁচেছেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। শান্তিনিকেতনে থেকেছেন। মা কমলার নির্দেশে বিয়ে করেছেন ফিরোজ গান্ধীকে। বড় ছেলে রাজীব, তাঁর স্ত্রী ইতালিয়ান মেয়ে সোনিয়া। ওদের ছেলে রাহুল, মেয়ে প্রিয়াঙ্কা। ইন্দিরার ছোট ছেলে সঞ্জয়, তার স্ত্রী শিখ মেয়ে মানেকা, ওদের ছেলে ইন্দিরার বড় নাতি। ইন্দিরার ছোট ছেলেকে কে বা কারা গুলি করে খুন করেছে আকাশে। ইন্দারার মৃত্যু হয়েছে শিখ বডিগার্ডের অবহেলায়।

অটলবিহারী বাজপেয়ী চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী। জন্ম ১৯২৩, প্রথমবার তেরদিন দেশ শাসন করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে তের নম্বর প্রধানমন্ত্রী হয়ে পোখরানে এটমবোম ফাটিয়ে পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন। অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পেলে, আলো-আঁধারে তাঁকে ডেকে গোপনে বলেছেন, কী করে দুর্ভিক্ষকে দূরে ফেলে দিতে পারি তা বলবেন। অটলবিহারী বাংলার সোনার মেয়ে জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে বলেছেন, তোমার স্বামী অবতার সিংকে ডাক, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করব। দেশকে বলেছেন,—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে

বাংলা সঙ্গীতে সুফীবাদের প্রভাব

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সঙ্গীতে সুফীবাদের প্রভাব-বিষয়ের গভীরে যাওয়ার আগে এই ধর্মমতের উদ্ভব, বৈশিষ্ট ও দর্শন বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

খৃষ্ট ধর্ম অভ্যুত্থানের কয়েক শতাব্দী পরে আরবে হজরত মহম্মদের প্রবর্তনায় ইসলাম ধর্মের শুরু হয়। সকল ধর্মের মূল কথা প্রেম হলেও ইসলাম ধর্মের শুরু থেকেই হিংসা দ্বন্দ্ব ও রক্তপাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীরা পাশবিক শক্তির সাহায্যে পাশ্ববর্তী— রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে থাকেন। রক্তপাত-হিংসা-ভীতি প্রদর্শন আর ধর্মপ্রচার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। হিংসাশ্রয়ী এই ধর্মপ্রচার দেখে ইসলামের অনুগামী একটি সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। তাঁদের মতে, হিংসা নয়, প্রেমই হোক ধর্মপ্রচারের বাহন। মানুষকে ভালবেসেই মানুষের হৃদয় জয় করা হোক। কিন্তু অত্যুৎসাহী প্রচারকেরা হাজার বছর অপেক্ষায় রাজী ছিল না। তারা বাধা পেয়ে আরও হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠল। প্রেমধর্মের উপাসকদেরই তারা আক্রমন করল। আত্মরক্ষার্থে তখন প্রেমের উপাসক সুফী সাধকরা দেশ ছাড়া হলেন। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে একটি কথা মনে রাখা দরকা, সুফী ধর্মমত ইসলামের একটি অনুগামী সম্প্রদায়। শুধু এদের দর্শন পৃথক।

এক কথায় বলা যায় সুফী ধর্মমত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ইসলামী ধর্মমত। প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী ধর্ম যেখানে হিংসাশ্রয়ী হয়ে আত্মপ্রসারে উৎসুক সেখানে সুফীমত প্রেমধর্মের উপাসক।

মধ্য এশিয়ার বহু দেশ প্রাক ইসলাম যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মানু-সারী ছিল। ইসলামের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশগুলি একে একে ধর্মান্তরিত হতে থাকল। তাদের ধর্মের মূল তত্ত্ব ও দর্শন আগ্রাসী ইসলামী ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। এই ভাবে, ইসলাম বৌদ্ধ ও উপনিষদীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণে ও সম্মিলনে গড়ে উঠল। এক নতুন ধর্মমত। অহিংসা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, উপবাস, যোগ-সাধনা প্রভৃতি আদর্শই হয়ে উঠল এর মর্মবাণী। ইসলামী পণ্ডিত ইউসুফ হোসেনের মতে, ইসলামের বক্ষোদেশ থেকেই সুফীবাদের জন্ম। সুফীরা হজরতকে পয়গম্বর ও কোরানকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে মানতেন। তবে তাঁরা ইসলামী ধর্মপালন পদ্ধতি অথবা ইসলামী আচার পালনের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, পবিত্র অন্তরের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সম্ভব। প্রেমই হল ঈশ্বর লাভের প্রধান সোপান।

সুফী কথাটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যেই মতান্তর আছে। কেউ বলেন—

(১) সাদা বা পবিত্রতা থেকে শব্দটি এসেছে।

(২) সাফ বা সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান মানুষদের মধ্যে শীর্ষে অবস্থানকারীদের বোঝাতে শব্দটি এসেছে।

(৩) সুফ শব্দটির অপর অর্থ হল পশম। তারা পশমের বস্ত্র পরতেন বলে তাঁদের সুফী বলা হত।

তাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদে বিশবাসী ছিলেন। তাঁদের রহস্যবাদী ও মরমীয়া সাধক বলেও অনেকে অভিহিত করেন। তাঁরা সাধনার সোপান হিসাবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, দারিদ্র, কৃচ্ছ্রসাধনা, উপবাস, প্রাণায়াম, সর্ব জীবে প্রেম, একেশ্বরবাদ, ঈশ্বরে আত্মনিবেদন প্রভৃতিও তাঁদের ধর্ম

বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল। অপরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা অসূয়া তাঁরা প্রশ্রয় দিতেন না।

প্রথম সূফী হিসাবে আবু হাসিম-এর নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ফারুখ আল কারখী, আবু সুলেমান, আল দারানী উল্লেখযোগ্য সূফী প্রচারক ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে কবি ফরিদ উদ্দিন আত্তার, জালালুদ্দিন রুমী ও শেখ সাদীর মত সূফী কবির আবির্ভাবের ফলে সূফী দর্শন খ্যাতি লাভ করে।

দ্বাদশ শতকের শেষ পাদে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি ভারতে আসেন। আগ্রা-দিল্লীর শাসকেরা এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তী কালে সুফীরা চিস্তি / সুরাবর্দী প্রভৃতি সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। নিম্নবর্গের নির্যাতীত হিন্দুদের তাঁরা ধর্মান্তরিত করেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নাম থেকেই তাঁর অনুসারীদের আউল নাম হয়েছে। নিজামুদ্দিনের শিষ্যদের মধ্যে কবি আমীর খসরু এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় জনজীবনে সুফীরা প্রথম থেকেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে কারণ সুফী গোঁড়া ইসলামীদের মত সংকীর্ণ ছিলনা, তারা বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করত। তাদের চরিত্র কলুষমুক্ত ছিল। তারা সুরাপান, জুয়া খেলা বা নারীসঙ্গ করত না। তাঁরা চলিত হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে নিচের তলার মানুষের কাছাকাছি চলে আসেন। কাওয়ালী সঙ্গীতকে এবং নৃত্যকে তারা যোগাযোগের মাধ্যম করে তোলেন। সুফীরাই ইসলামের ভারতীয়করণ ঘটায়।

সুফী অনুসারী কবিরা ভারতীয় সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন। ষোড়শ শতকে মালিক মহম্মদ জায়শী ওবধী ভাষায় পদ্মাবৎ কাব্য রচনা করেন। পরবর্তী শতকে কবি আলাওল বাংলা

ভাষায় তার অনুবাদ করেন। ১৮/১৯ শতকে কবি মীর এবং গালিব উৎকর্ষ আনেন।

বাংলা দেশে সুফীদের আগমন প্রাচীন কাল থেকেই। সরল নিষ্পাপ জীবনযাত্রা তৃণমূলের মানুষদের চিত্ত জয় করে নেয়। তারা গূঢ় ব্যঞ্জনাময় অথচ সাদা মাটা শব্দ দিয়ে গান রচনা করত। তাতে সুরারোপ করত এবং তারযন্ত্র সহযোগে নেচে নেচে গান গাইত। তারা নিজেদের বলত ফকির / দরবেশ। গুরু বা মুর্শেদকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

ঈশ্বরপ্রেমে ব্যাকুল বা বাতুল থেকে বাউল শব্দের সঙ্গেও অনেকে মিল খোঁজেন। এরা সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে ধর্ম সাধনা করত। এদের সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া পন্থীদের ভাবগত মিল লক্ষ্য করা যায়। অধর চাঁদকে ইন্দ্রিয়াত্মক বস্তু জগতের মধ্যে ধারণ করা যায় না। ইনিই বিশ্বদেবতা, জীবন দেবতা, অচিন পাখী। জীবদেহে এর খোঁজ পেলে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ হয়। সুফী মতে অলখ নুরকে পেলে ফানা ধ্বংস হয়ে বাকা লাভ হয়। এর জন্য মন্দির মসজিদে যাবার প্রয়োজন হয় না।

ডঃ রমা চৌধুরী সুফীদর্শন বিষয়ে বলেছেন, সুফী মতে ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম অর্থাৎ বেদান্তের ব্রহ্মের মত। তিনি অনাদি এবং অনন্ত, জগতে লীন হয়ে আছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, সুফীরা ঈশ্বর প্রেমে ব্যাকুল বা বাউল। **Dr. Nicholson**-এর বিশ্লেষণ হল, মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্তা। একটি জীব সত্তা, এবং অপরটি ভগবৎ সত্তা। জীবসত্তা মিলে যায় প্রেমসত্তায়। প্রেম স্বরূপে ফিরে যাওয়াই, সুফীবাদের প্রেম মিলনের আসল তত্ত্ব।

ধর্মান্ধ মুসলমানেরা সুফীয়ানাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। কিন্তু বিশ্ব জনসংখ্যার নিরিখে এদের সংখ্যা কম নয়—প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। বলেছেন বৃটিশ গবেষক **Tad Hugs**।

সুফী দর্শনে ঈশ্বরের সাতটি গুণ—প্রাণ, জ্ঞান, সংকল্প, বল, বাক্য, শ্রবণ ও দর্শন। প্রাণ দ্বারা ঈশ্বর নিত্য স্থিতিশীল এবং চরাচরের স্থিতির কারণ। জ্ঞান দ্বারা তিনি সর্বজ্ঞ, সংকল্পের দ্বারা তিনি উপকরণ ও প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজ মনস্কাম পূর্ণ করেন। বল দ্বারা যা আপাত অসাধ্য তা সাধন করেন। বাক্য দ্বারা তিনি আজ্ঞা দেন। শ্রবণ দ্বারা তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। দর্শন দ্বারা তিনি সবকিছু দেখেন। জগৎ অনিত্য কারণ যার আদি আছে এবং অন্তও আছে তা অনিত্য বই আর কি?

সুফীমতে সাধকদের বলা হয় ফকির বা দরবেশ। তাদের গুরু বা মুর্শেদের কাছে সাধন মার্গের গুহ্য তত্ত্ব শিখতে হয়। শিষ্যের যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হলে মুর্শেদ তাকে তালি বা তাপ্পি দেওয়া পোষাক দেন। সুফীদের মতে এই তালি দেওয়া পোষাক দারিদ্র ও বৈরাগ্যের চিহ্ন। এক অর্থে সুফী সাধকরা পর্যটকও বটে। তাঁদের সাধনার সাতটি সোপান অতিক্রম করতে হয়। এগুলি হল—অনুতাপ, সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র, ধৈর্য, ঈশ্বর বিশ্বাস এবং সন্তোষ।

সুফীরা নিজেদের আলোর পথযাত্রী বা আলোক অভিসারী বলে ভাবতে ভালবাসে, তাঁরা জ্যোতির্বিলাসী। সুফী কবি মসনবী জালাল লিখেছেন,

"জুমলাহ ম'শুক অস্ত আশিক পরদায়ী"
(রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি)

রবীন্দ্রনাথ

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক সুফী সাধককে বলা হয় পর্যটক। মানুষের ঈশ্বর লাভের প্রচেষ্টাকে বলা হয় পর্যটন। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সঙ্গে এর ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়—'মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ / মরুতীর হতে সুধা শ্যামলিম পারে।'

রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা···ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে পদ্ধতি ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা শূন্য।"

সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সুফী দর্শন ভারতবর্ষে নতুন ভাবে এসেছিল মাত্র। এটি ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। রবীন্দ্রনাথও তার রচনায় অনুরূপ ভাবপ্রকাশ করেছেন।

সুফী সাধনায়, ঈশ্বর কখনো আশিক বা প্রেমিক। আবার কখনো মাশুক বা প্রণয়িনী। রবীন্দ্র রচনায় সুফী সৌরভ পাওয়া যায়। কবিতা ও গানের কেন্দ্র যে জীবনদেবতার অধিষ্ঠান তাকে কবি কখনো পুরুষ, কখনো নারীরূপে কল্পনা করেছেন। সে জীবনদেবতার একটুকু ছোঁয়া পেয়েছেন, একটুকু কথা শুনেছেন, তাকে বহুপাশে বাঁধতে পারেন নি। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতা থেকে উদ্ধৃত করি...

"শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ
শুধু কানে আসে জলকলরব...
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি
কহিবে না কথা, দেখিতে পাবনা নীরব হাসি।"

উপনিষদের মধ্যে সুফী ধ্যান ধারণা বিদ্যমান। সুফীরা যেমন অন্তরের আলোয় বৃক্ষে-তৃণে, ইট-কাঠ, পাথরে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, উপনিষদেও অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। "যিনি এক, যাঁর কোন বর্ণ নেই, যিনি নানা শক্তি যোগে

নানা বর্ণের মানুষের নিজনিজ প্রয়োজন বিধান করেন, যিনি সমস্ত কিছুর আদিতেও আছেন, অন্তেও আছেন, তিনি আমাদের দেবতা। তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।"

আমরা সাধারণ মানুষ সব সময় শুধু চেয়ে চলেছি। শুধু পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। সুফীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন! আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।...বা "তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।"

সুফীয়ানাকে সরমীয়াবাদ বা Mysticism-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক দৈবশক্তি সব কিছু শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষের পুরুষকার খুবই সীমিত। দৈবশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাকেই Mystical আখ্যা দেওয়া হয়। মরমী হচ্ছেন তিনি যাঁর আসল অনুভূতি বহির্জগতের শুধু ইন্দ্রিয়যোগে জড়িত নয়। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করলে তবেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আসে। বাইরের আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্তরের আলোয় উপলব্ধি করাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। যিনি আলোর আলো, যিনি আলোয় আলোকময় করে দ্যুলোক ভূলোক প্লাবিত করে আসেন তাঁকে দর্শন করার অন্তরের ইচ্ছা ত সবার। রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন ঃ

"চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।"

এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদ,—

"(আমার) বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা / তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি!
আঁধার পেরিয়ে আলা।"

মরমীয়া চিন্তার ক্ষেত্রে উপনিষদের স্থান সর্বোচ্চ শিখরে। রবীন্দ্রনাথ উভয় দর্শনের ক্ষেত্রে সাবলীল ভাবে বিচরণ করেছেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, আমরা লবণের পুতুল, সচ্চিদানন্দ রূপ জ্যোতি সমুদ্রে গলে মিশে একাকার হয়ে যেতে চাই। রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে বলেছেন। 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।'

মরমীয়ারা আলো অভিসার করতে চেয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রেও চরৈবেতি মন্ত্রের উল্লেখ আছে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আগে চল, আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

উপনিষদে বলা হয়েছে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ কর।' 'নাল্পে সুখম অস্তি, ভূমৈব সুখম।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"চাওয়া পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোন মতে
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনারে দিই আনি
আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ অন্ধ করা
তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা;
জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলাম ভুলে
এখন জীবন মরণ দু দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।"

বিধাতা দুঃখ দিয়েই কাছে টানেন। তাই দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। "দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক, তবে তাই হোক / মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃত-ময় লোক / তবে তাই হোক।" কবি তাঁর মেয়েকে একটি চিঠিতে লিখেছেন,—'সে যেন জীবনে সুখী হয়। কিন্তু অবিমিশ্র সুখ এই পার্থিব জীবনে পাওয়ার নয়। সে যেন আপন অন্তরের তেজে দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করার শক্তি অর্জন করতে পারে।' এই করেছ ভালো নিঠুর...দুঃখই মানুষ ও দেবতার মিলন সেতু। তাই ঝড়ের রাতেই পরাণসখা বন্ধুর অভিসার।

বেদনা দেবতার দান। উচিত তা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করা। দুঃখকে স্বীকার করে নেওয়াতেই মুক্তি, বর্জনে নয়। দুঃখের মধ্যে পরমানন্দকে খুঁজে নিতে হবে। মনকে বোঝাতে হবে—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে,
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে॥"

এবার আসি বাউলদের কথায়। বাউলরা মিশ্রসত্ত্ব। বাউলদের মধ্যে বৈষ্ণব, সহজিয়া, সুফী ধর্মমত শক্তি সৌন্দর্যে সমীভূত হয়ে আছে। বাউলরা বৈষ্ণব ও সুফী ধর্মমত থেকে মানবতা, ঈশ্বর প্রেম ও আবেগময়তার ধ্যান-ধারণা লাভ করেছেন। বৈষ্ণবদের রহস্যময় প্রেমানুষঙ্গ বাউলদের মরমীয়া সঙ্গীতে মিশে আছে। বাউলগানে দৈবপ্রেমের মহিমা মানবিক মর্যাদায় সুপ্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উল্লিখিত সব বৈশিষ্টগুলির অবস্থান আছে। সঙ্গে আছে উপনিষদের মর্মবাণী। তাই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব ও এশিয়ান স্টাডিজ-এর অধ্যাপক Ed. Dimmose (Dr.) বলেছেন, Rabindranath—the greatest Baul of Bengal.

এবার বাংলার অন্যান্য বাউলের প্রসঙ্গে আসি। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাউল হলেন লালন ফকির। এর জন্ম সম্ভবতঃ ১৭৭৫ সালে। প্রথম জীবনে হিন্দু। পরবর্তী কালে সুফী ফকিরে পরিণত। তাঁর ভাষা স্নিগ্ধ ও গীতিমূর্ছনা পূর্ণ। অসংখ্য গান রচনা করেছেন। গান গাইতে গাইতে জেলার পর জেলা অতিক্রম করেছেন।

লালনের কয়েকটি গান ঃ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী / জাত গেল জাত গেল / সোনার মান গেলোরে ভাই / সময় গেলে সাধন হবে না / ফিরিঙ্গীরা রাজা হল / পেয়ে ধন সব হারালি / বাড়ির কাছে আরশি নগর / ধন্য

ধন্য বলি তাঁরে / ঘরের চাবি পরের হাতে / কী সন্ধানে যাই সেখানে / চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখী / বদ হাওয়া লেগে খাঁচায় / আমার ঘরখানায় কে।

অন্যান্য রচনাকারের কয়েকটি বাউল সঙ্গীত ঃ

রাই সাগরে নামল শ্যাম রায় / তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে / ত্রিবেণীর তীর ধারে সুধারে জোয়ার আসে / যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী / মন যদি চড়বিরে সাইকেল।

পঞ্জ শাহ ঃ

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি
ওরে মন পাগেলা
এ যেন বোবায় কালায় নিত্যলীলা।

প্রাপ্তিস্বীকার ॥ পত্রপত্রিকা

সাহিত্যমেলা □ পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। খণ্ড ২৩, সংখ্যা ২, ১৪০৭। ২৮।১, মান্নাপাড়া রোড, কলকাতা-৯০ তিরিশ টাকা বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা।

প্রকল্পনা সাহিত্য □ ভট্টাচার্য চন্দন। দেশী বিদেশী লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ইঙ্গ-বঙ্গ দ্বিভাষিক, সহস্রাব্দ সংখ্যা, জুন ২০০০ (১৬) পি ৪০, নন্দনা পার্ক, কলিকাতা-৩৪, কুড়ি টাকা।

অবরোধবাসিনী □ মিতালী বসাক। নবম বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০০০ 5, I., P. Appts, IIT Delhi, Hauzkhas, New Delhi—110016 দশ টাকা।

দীপশিখা □ প্রদীপকুমার সামন্ত। চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, উমেদপুর চাউলখোলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৭৭, শারদীয়া ১৪০৭ ১৫ টাকা।

ঢেউ □ অজয় দাস। শারদীয় ১৪০৭, বলরামপুর, পুরুলিয়া। ৫ টাকা।

ক্রৌঞ্চী □ পবিত্রকুমার দাস। ২২ বর্ষ, পূজা সংখ্যা। বিধান নগর, দার্জিলিং ৭৩৪৪২৬. আট টাকা।

লিটল ম্যাগাজিন সংবাদ □ নবকুমার শীল। ৮ আশ্বিন ১৪০৭, বিশেষ সংখ্যা।

শ্রদ্ধার্ঘ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য

বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের পূর্ব কৃত কর্মের জন্য বড়ই অনুশোচনা হচ্ছে। শৈশব ও কৈশোরের চপলতায়, যৌবনের মদমত্ততায় সেদিন উপেক্ষা করেছিলাম, সেই সব অসহায়, রোগগ্রস্ত দরিদ্র অনেক বৃদ্ধ মানুষকে যারা একদিন কত যত্নে কত পরিশ্রম ও উদ্বেগ নিয়ে আমাদের মত অনেকের জীবন গড়ার কাজে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের ত্যাগের মর্যাদা আমরা দিলাম না। নিজেদের বৃদ্ধ আত্মীয়দের প্রতি উদাসীন ছিলাম এ জন্য দুঃখ পাই। কিন্তু স্কুলের শিক্ষকদের দুর্দশার দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়াইনি এজন্য নিজেকে মহাপাতকী মনে হয়।

আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন নাম দুঃখীরাম মিত্র। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এণ্ট্রান্স পাশ করে গরীবী মাষ্টারী করতে এসেছিলেন। এতে অর্থ ছিল না কিন্তু সম্মান ছিল। তখনকার দিনে জমিদার বা অর্থবানদের দাক্ষিণ্যে স্কুল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠত। মহাদেবপুরের বসু পরিবারের আনুকূল্যে এই স্কুল গড়ে উঠেছিল। তাই সবাই বলত বোসেদের স্কুল। এই সব প্রতিষ্ঠান চলত মালিকদের মর্জি মাফিক। তাঁরাই শিক্ষক নিয়োগ করতেন, মাইনে ঠিক করতেন। লোকমুখে গল্প শুনেছি,—বোস বাবুদের এক চাকর স্কুলে পার্ট-টাইম কাজ করত—তার মাইনে ছিল মিত্তির বাবুর সমান। উনি মিনতি করেছিলেন অন্তত এক টাকা মাইনে বাড়াতে। তা মঞ্জুর হয় নি।

পরে যখন সরকারী ব্যবস্থা চালু হল, যোগ্যতা না থাকায় কাগজে কলমে মিত্তির বাবুর চাকরী গেল, যদিও উনি আগের

মত শিক্ষকতা করতে লাগলেন। ওকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক করা হয়েছিল। ফলে বেতন সামান্য হলেও নিয়মিত হয়েছিল। প্রাথমিক স্কুল বসত সকালে, ঐ স্কুল শেষ হলে তিনি হাইস্কুলে চলে আসতেন। ঘণ্টা দিতেন, শিক্ষকদের চক ডাষ্টার গুছিয়ে দিতেন। কেরানী ছিলেন অতিবৃদ্ধ। মিত্তির বাবু তাঁরও কাজ করে দিতেন। এছাড়া ক্লাস এইট পর্যন্ত ইংরাজি, বাংলার ক্লাস নিতেন যদি কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকতেন, সব বিষয় তিনি ভাল পড়াতে পারতেন না কিন্তু দেখতেন কোন ক্লাস বাদ না যায়।

ছেলেরা প্রায়ই তাঁকে বিরক্ত করত। উনি কর্কশ গলায় চেঁচামেচি করতেন। ময়লা হাফসার্ট, হাটুঝুল ধুতি, ছেঁড়া কেডস্, দুচার দিনের গজিয়ে ওঠা দাড়ি সব মিলিয়ে টিপিক্যাল গ্রাম্য শিক্ষক। ওর কাছে পড়ত কিছু দুষ্টু, ফাঁকিবাজ ছেলে, মাস মাইনের সিকি, আধুলি টাকাও প্রায় দিত না। প্রায়ই উনি ঝালবড়া সহযোগে চা খেতেন। ছেলেরা বলত 'তাবড়া—বড়া।' অথচ সারা বছর ওঁর পিছনে ছোটা চাই। নিশ্চিত ছিল চা ও বড়া খাইয়ে কিছু সুবিধে আদায় করা যাবে। স্কুলে মাইনে বাকী, পরীক্ষায় বসা যাবে না, অগতির গতি মিত্তির মশাই। প্রতি পরীক্ষার প্রথমদিন একটা লম্বা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ছেলেরা যে যেমন পারত আট আনা, এক টাকা, দু টাকা জমা করে পরীক্ষা দিতে পারত। পরীক্ষায় নম্বর জানতে হবে, যার কাছে নিশ্চিন্তে আব্দার করা যায় তিনি মিত্তির মশাই। ইংরাজি বা অন্য বিষয়ের খাতা সেই বিষয়ের শিক্ষক দেখে উঠতে পারছেন না, অথচ নির্দিষ্ট দিনে ফল প্রকাশ করতে হবে। কাজেই মিত্তির মশায়ের ডাক পড়বেই। ব্যাপারটা জেনেই কিছু ছাত্র তৎপর হবে কি ভাবে খাতাটা মিত্তির মশায়ের কাছে আনা যায়, তাহলে ১৫।২০ নম্বর বেশী হবেই। আমি দূর গ্রামের ছাত্র এত সব জানতাম না। ক্লাস এইটের বাৎসরিক পরীক্ষায় সবচেয়ে ভাল ছাত্র পেল

৫৩ আর আমি পেলাম ৭৫, পরে শুনেছিলাম আমার খাতা ভাগ্য-ক্রমে পড়েছিল মিত্তির মশায়ের হাতে। ভাল ছাত্রটি মার খেল ইংরাজির কড়া মষ্টার মশায়ের হাতে। এর আগে ক্লাস সিক্সের বাংলার পরীক্ষায় ৭৯ নম্বরের উত্তর করে ৮১ পেয়েছিলাম। ব্যাকরণের প্রশ্নগুলি কঠিন ছিল বলে মিত্তির মশাই ব্যাকরণের নম্বর গুলো অন্য প্রশ্নতে জুড়ে দিয়েছিলেন। স্কুল ছাড়ার বেশ ক বছর পরে এক ভাইপোর নম্বর আনতে গিয়েছিলাম, দেখলাম ইতিহাসে ৬৫ পেয়েছে অথচ তার পাশ করাই সন্দেহ ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম স্কুল থেকে অবসর নিলেও মিত্তির মশাই খাতা দেখছেন। ভাইপো এত বেশী পেল কেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন—এর পর তো আর পাবে না তাই দিয়ে দিলাম।

মিত্তির মশাইকে কোন দিন ভাল পড়াতে পারেন বলে মনে হয়নি, বরং শিক্ষকরা, অভিভাবকেরা, এমন কি ছাত্ররা শিক্ষক হিসাবে মিত্তির মশাইকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত। ক্লাসে ওকে কখনও চেয়ারে বসে পড়াতে দেখিনি, ঢুলতে দেখিনি, কামাই ছিল না। সকলের মধ্যে ওকেই একমাত্র কর্মী, জীবন্ত ব্যস্ত মানুষ মনে হত। স্কুলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য ওর ছিল আন্তরিক পরিশ্রম। সরকার স্কুল শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা দিত ১০্ বা ১৭·৫০ টাকা। শর্ত ছিল স্কুলকেও ঐহারে দিতে হবে। মিত্তির মশাই গ্রামান্তরে গিয়ে অর্থবান প্রাক্তন ছাত্র বা অন্যদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে ডোনেশান আনতেন। বিল্ডিং ইত্যাদি ব্যাপারে স্কুলকে কিছু অংশ খরচ দিতে হোত। মিত্তির মশাই গ্রামান্তরে গিয়ে ঐ টাকার জন্য চেষ্টা করতেন। স্কুলের ব্যাপারে উনি ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ।

আজকাল ছাত্ররা শিক্ষকদের নাম বা পদবীর সঙ্গে "স্যার" যোগকরে সম্বোধন করে। সে যুগে আমরা বাবু যোগ করে

ডাকতাম। কিন্তু মিত্তির মশায়ের সঙ্গে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সহজ সম্পর্ক বলে "দুঃখীরাম বাবু" কেউ ডাকত না। কেউ ভয় করত না, সকলেই ভাল বাসত। ছাত্ররা গোলমাল করলে পাখার বাঁট উঁচিয়ে ছুটে যেতেন কিন্তু মারতেন না। একবার এক ছাত্র বাৎসরিক পরীক্ষায় সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও খাতা না দেওয়ায় একজন শিক্ষক খাতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ছাত্রটি দারুন উত্তেজিত হয়ে অফিস ঘরে গিয়ে সব শিক্ষকের সামনে বলেছিল, উক্ত শিক্ষক যখন একা রেল লাইন ধরে বাড়ী ফিরবেন তখন গৃহস্থদের গরুর খোঁটা দিয়ে ওঁকে পেটাবে। শুনেই মিত্তির মশাই পাখার বাট নিয়ে তেড়ে গেলেন কিন্তু কিছু করলেন না। তখন হেড মাষ্টার মশাই ছাত্রটিকে ধরে খুব বেত দিয়ে মারতে লাগলেন। মিত্তির মশাই সহ্য করতে না পেরে বললেন "আর মারবেন না, মরে যাবে।" এই ভাবে হেডমাষ্টার মশাইকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

সে যুগে ধাড়ী থেকে গ্রামে শিক্ষকতা করে বেশ কিছু শিক্ষক নানা উপায়ে বিষয় সম্পত্তি করতেন। কিন্তু মিত্তির মশাই আদৌ বিষয়ী মানুষ ছিলেন না। নিজের সন্তানদেরও ভাল ভাবে গড়ে তুলতে পারেন নি। এমন কি পৈত্রিক সম্পত্তি সামান্য জমি, পুকুর, বাগান এসব ব্যাপারেও নজর দেননি। ফলে সব কিছু বেহাত হয়েছিল। সে যুগে শিক্ষকদের পেনশন চালু হয়নি, ফলে অবসর গ্রহণের পর তিনি অনেক শিক্ষকের মতই আর্থিক দুরবস্থার শিকার হয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের পরেই তিনি গ্রামান্তরে স্কুলের কাজের জন্য গেছেন, দেখা হলেও কখনও সাহায্য চাননি। আমার এক বোনের বিয়েতে উনি বরযাত্রী এসে ছিলেন, পাত্র ছিল ওঁর প্রাক্তন ছাত্র। সেই কথা মনে রেখে আমার বৌভাতে লোক মারফৎ ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, উনি এসে-

ছিলেন। তাঁর সাথে সেই আমার শেষ দেখা। আরো ক'বছর পরে শুনেছিলাম উনি মারা গেছেন।

মিত্তির মশাইয়ের অবসর জীবন কেমন কেটেছিল জানি না, তবে সহজে কল্পনা করা যায় হাজার হাজার শিক্ষকের মতই অভাব অনটনে দিন কেটেছে। এখন বৃদ্ধবর্ষে সরকার তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সর্বস্তরের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে আবেদন,—আসুন আমরা যৌথ ভাবে আবেদন,—আসুন আমরা যৌথ ভাবে আমাদের পিতৃসম শিক্ষকদের অবসর জীবনে আন্তরিক সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা ভরা গুরুদক্ষিণা নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অনিশ্চিত শেষের কটা দিন সুখময় করে তুলি।

মিত্তির মশাই শিক্ষকতার মাপকাঠিতে সাধারণ পর্যায়ে পড়েন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত কৃতীছাত্রদের গড়ে তোলার দাবী তিনি করতে পারেন না। তবু এক নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁর অবদান আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজকের বিশাল স্কুল বিল্ডিং, অনেক ডিগ্রীধারী কৃতী শিক্ষক, প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সমাগমে কেউ সেদিনের শ্রমিক শিক্ষককে স্বাভাবিক ভাবে মনে রাখে না। আমি কিন্তু গ্রামান্তরে থেকেও সেই মানুষটির ঘাম, রক্ত ও স্বপ্নভরা শ্রমের চিহ্ন প্রতিটি ইঁটের মাঝে কল্পনা করি। অনুভব করি তাঁর অশরীরী আত্মার স্কুল পরিবেশে সদা ব্যস্ত মঙ্গলময় অস্তিত্ব। তাই তাঁকে স্মরণ করে নিবেদন করলাম আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ।

আমেরিকার চিঠি

পিয়া চক্রবর্তী

একটি মজার চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। একা উপভোগ না করে সকলকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদটা জমে বেশি। তাই চিঠিটি ছেপে দেওয়া হল। এই চিঠিতে উল্লিখিত ভাইটু, দিদিভাই, দাদা ভাই, বারবি, তাতাই দিদি, রং, তুলি, তাতুম—এরা সকলেই লেখিকার মামাতো, মাসতুতো ভাই-বোন।

এই চিঠি পড়ে আমাদের মনে হলো,—আজ লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন ডি. সি-র ভাষায় যে পার্থক্য তৈরি হতে চলেছে, হয় তো আগামী দুশো বছরে কলকাতা এবং ঢাকার ভাষারও সেই অবস্থা হতে পারে। ইত্যাদি এবং সামাজিক, মানসিক ও পরিবেশ বিষয়ে আধুনিক দুনিয়ার কিশোর-কিশোরীদের কথা ভেবেও চিন্তার সুতোয় বুঝি বা একটু টান পড়ছে। প্রাচীনরা দুশ্চিন্তা করুন, কিন্তু নবীন এগিয়ে চলবে তার নিজস্ব গতিতে। চরৈবেতি।—স, অ।

Hi Bhait to ! How ru ? how's every1 at hazra ? can ya understand my riting ? hope so. ovr here we make evry thing in short form. wel at least people my age do. so......how's school ? guess wut ? ? ? ? i'm 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i'm so cool ! im a teenager now ! did ya remember my birthday ? ? if ya didnt thats ok b cuz i hav no idea wen ur birthay is either. my birthay is october 28 if ya didn't kno. so where is this computer located at ? hav u gotten into n e

trouble latly ? i haven't. im a good grl —) how's did bhai and (.) ? how is barbie and bhai da and tha thai didi ? i cant list every1 so i will stop rite there. ok b 4 i stop…how is cute thuli and thathum ? i hav another email adress too. it is ndngrl 4 eva @hotm in other words ndngrl 4eva means Indian girl forever. i havent started using that1 but if u want to email me there then i will start using that adress, first reply to this email and say which 1 u would like 2 email at. I dont know wen we r going 2 calcutta. hav u heard that i hav performed in a fashion show and danced to chaiyya chaiyya and ak palka jeena at the puja ? tell did bhai and barbie that i watched kaho na pyaar hai and fiza. i didnt like fiza but kahona pyaar hai wuz pretty good. well that is all that i hav time 2 write rite now. since i always use the computer to emil and am 2 lazy 2 rite letters i am asking u 2 give didi bhai and barbie news on me. i mite write them a letter and email it to u and u can tell them wut i said. and tell barbie and didi bhai not to feel bad. i wrote them a letter (about 6 pages) in june but i never sent it b cuz i kept 4 getting to. im sorry :—(study hard dont 4get ur homework (our scool phrase) luv ya always,……Pia…

রূপসীর পথে কলকাতা

সুব্রত চক্রবর্তী

১৯৭২ এর ৪ঠা জুলাই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ট্রাংক কলে জানালো, ৮ই জুলাই কয়েকটা দরকারী কাগজপত্র নিয়ে আমাকে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হাতে সময় খুবই কম। প্লেনেই কোচবিহার থেকে ৭ই জুলাই-এর মধ্যে রওনা দিতে হবে। খোঁজ খবর নিলাম। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেন সপ্তাহে তিন দিন কলকাতায় যায়,—রবি, বুধ ও বৃহস্পতিবার। ৭ই জুলাই শুক্রবার। প্রাইভেট প্লেন জাম-এয়ারের সন্ধান পেলাম। সপ্তাহে ৫ দিন ফ্লাইট আছে তেলি-পাড়া থেকে আর বাকি ২ দিন আছে আসামের ধুবড়ীর অদূরে রূপসী থেকে। শুক্রবার প্লেন ধরতে হবে রূপসী থেকে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের ভাড়া ১৩০ টাকা, এছাড়া বাংলা দেশ আকাশপথ ব্যবহারের ট্যাক্স ৭ টাকা,—একুনে ১৩৭ টাকা। সেই তুলনায় জাম—এয়ারের ভাড়া ১০০ টাকা, আর বাংলাদেশ ট্যাক্স ৫ টাকা নিয়ে ১০৫ টাকা। কিন্তু ৩২ টাকা কম ভাড়া নিয়েও ওরা কোচবিহার থেকে, যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় প্রাইভেট গাড়িতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

৭ই জুলাই কোচবিহার জাম-এয়ারের অফিসে হাজির হলাম সকাল ৯ টার কিছু পরে। মাত্র দুইজন যাত্রী। অন্যজন অনিল কুমার সেন, ব্যবসায়ী, থাকেন কলকাতায় সূর্য সেন ষ্ট্রীটে। গতকাল দুপুরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেনে কোচবিহার এসে আজ কলকাতায় ফেরার তাগিদে রূপসীর পথে সহযাত্রী হয়েছেন।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সিক্সটি-টু মডেলের এ্যামবাসাডর। সকাল সাড়ে নয়টায় রওনা দিলাম।

কোচবিহার থেকে পূবদিকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ঘরঘরিয়া, কালজানি ও মরা রাইডাকের ওপর সেতু পার হয়ে গাড়ি এল তুফানগঞ্জ। সেখান থেকে রাইডাকের ওপর বড় সেতু অতিক্রম করে গাড়ি ছুটে চলল বাংলা ও আসামের সীমান্ত শহর বক্সিরহাটে। কিছু পরে রাস্তার পাশে সাইন বোর্ড দেখে মালুম হল, আসামে ঢুকেছি। পথ এবারে সোজা দক্ষিণমুখো। এই পথে একটু যাবার পর বাধা পেলাম চেক পোষ্টে, নাম ছাগলিয়া। দুর্ভোগ বিশেষ হয়নি। গাড়ির নম্বর ও গন্তব্যস্থল লিখে নিয়ে দুই কর্মকর্তা নির্দেশ দিলেন রাস্তা আটকানো শালের লম্বা গুঁড়িটাকে একপ্রান্তে বাঁধা দড়িটাকে কিছু আলগা দিতে। আমরাও ঢেঁকি কলের উঁচু প্রান্তের তলা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এই অঞ্চলের জাতীয় সড়ক ৩১ যথাযথ সুনাম বজায় রাখতে পারেনি। যান বাহনের চাপে অনেক জায়গায় বসে গিয়েছে, আর কিছু জায়গায় উঠে গিয়ে রাস্তার হাড় পাঁজরা প্রকট হয়েছে। মেরামতির জন্যে রাস্তার পাশে রাখা ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ চোখে পড়ল। ডলোমাইট শ্রেণীর পাথর। রঙে উজ্জ্বলতা নেই, বিবর্ণ ছাই রঙের যেন ওরা পাথরের শব। এখনই ওরা মরে আছে, গরম পিচ ওদের পেটে সহ্য হলে হয়, এর পর তো হবে দশ-টনি রোলারের দলাই মলাই, আর মাল বোঝাই কুড়ি বাইশ টনের দুর-পাল্লার ট্রাকের অবিরাম অত্যাচার।

সীমান্ত থেকে মাইল দশেক যাবার পর ছোট এক জনপদ, নাম আগমনী; এই বর্ষায়ও চিরন্তন শরতের আগমন ঘোষণা করে। পথের দুপাশে কিছু বাড়ি ঘর দোর। বাড়িগুলো আসামী ধাঁচের। মাথায় টিনের চালা, তবে ওপরটা একেবারে আটকানো নয়,—দুপাশের টিন কিছুটা ঘোমটার মত এগিয়ে এসেছে বাতাস

চলাচলের জন্যে, খড়খড়ি দেওয়া ভেণ্টিলেটার বসাবার প্রয়োজনে।
চলাচলের জন্যে, খড়খড়ি দেওয়া ভেণ্টিলেটার বসাবার প্রয়োজনে।
টিনের চালটিকে ধরে রেখেছে কাঠের ফ্রেমে, আর এই ফ্রেম রয়েছে শাল কাঠের খুঁটির ভরসায়। বাড়িগুলোর মেঝে পাকা, আর পাকা আছে ঘরের দেওয়ালটি জানলার তলা পর্যন্ত; দেওয়ালের ওপরের অংশটি মুলীবাঁশের দুপাশে সিমেণ্টের পলেস্তারার ওপর চুণকাম দিয়ে হালকা ভাবে তৈরি করা। সাদা চুণকামের পটভূমিকায়, সবুজ কিংবা নীল রং দেওয়া খুঁটি ও ফ্রেমগুলো আলাদা সৌন্দর্য এনেছে।

আগমনী ছাড়িয়ে মাইল দশেক যাবার পর এক বিরাট নদী, সঙ্কোশ। এর ওপর করা প্রায় আটশ ফুট লম্বা ষ্টীল ফ্রেমের ব্রীজ পার হয়ে এলাম গোলকগঞ্জে। এখানে এক চায়ের দোকান দেখে পুরণো মডেলের গাড়িটাকে বিশ্রামের জন্য দাঁড় করানো হল। গাড়ির বনেট খুলে রেডিয়েটারে জল ঢেলে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার ফাঁকে আমরা দুজনে নেমে পড়লাম।

রাস্তার ওপর পাশাপাশি কয়েকটা দোকান ঘর। ফটোগ্রাফির, পান বিড়ি সিগারেটের, চা বিড়ি সিগারেটের, চা মিষ্টির ও গাড়ি মেরামতির দোকান সহ-অবস্থান নীতি মেনে নিয়েছে। চা মিষ্টির দোকানে চা খেতে আমরা ঢুকেছিলাম। দেখলাম, দোকানের সাইনবোর্ড, মূল্য তালিকা এবং খুচরো পয়সার বিষয়ে ক্রেতাদের প্রতি নির্দেশ,—সবই বাংলা হরফে লেখা, কিন্তু পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়। অসমীয়া ভাষায় লেখা বলে।

মিনিট দশেক বিশ্রামের পর গাড়ি ছুটে চলল পূব দিকে। রাস্তার ডানদিকে মিটার গেজের রেল লাইন পাশাপাশি চলেছে। মাইল বারো যাবার পরে এলাম গৌরীপুরের চৌমাথায়। সামনে গোহাটি, ডাইনে ধুবড়ি, আর বামদিকে পথ গিয়েছে রূপসীর দিকে। বড় রাস্তা ছেড়ে বামদিকে রূপসীর পথে গাড়ি বাঁক

নিল। এই পথে কিছুদূরে যাবার পর গাড়ির ড্রাইভার ডানদিকের এক বড় বাগান বাড়ি দেখিয়ে জানালেন, বাড়িটা গৌরীপুরের জমিদার প্রমথেশ বড়ুয়ার, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যাঁর নাম স্মরণীয়।

মাইল তিনেক যাবার পর এলাম রূপসীতে। শহরে যাবার রাস্তা ডানদিকে, আর সোজা রাস্তা গিয়েছে শাল সেগুন গাছের জঙ্গলে ঘেরা রূপসী এয়ারপোর্টে। এখানে বেলা সাড়ে এগারোটায় হাজির হয়ে জানলাম প্লেন আজ লেট, আসবে বারোটা পঞ্চাশে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকানেরা ধুবড়ির কাছে শাল সেগুনের জঙ্গলে ভরা রূপসীকে যুদ্ধের প্লেন ওঠা নামার জন্যে বেছে নিয়েছিল। এর পর স্বাধীন ভারতে রূপসী এয়ারপোর্টের উন্নতি। বিরাট দোতলা বাড়ির ছাদে বায়ুর গতি নির্দেশক যন্ত্র, রেডার ও রেডিও টেলিফোনের যন্ত্রাংশ শোভা পেয়েছে। এ সবের গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনীয় সশস্ত্র প্রহরীরা সদা তৎপর রয়েছে।

বেলা বারোটায় একটা বাস এসে দাঁড়ালে, ভেতর থেকে নেমে পড়ল ধুবড়ি থেকে জোগাড় করা এই ফ্লাইটের জনা পনের যাত্রী।

টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের দোতলায় লাউঞ্জে প্লেনের প্রতীক্ষায় সকলে সময় কাটাচ্ছে। খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনের পাতায় কয়েকজন নজর দিচ্ছে। সময় যেন আর কাটে না। এক সময়ে, বেলা একটার কাছাকাছি জানা গেল প্লেন আসছে। খবর পেয়ে আমরা সকলে দোতলার বারন্দায় ভিড় করলাম।

রূপসী এয়ারপোর্টের কংক্রীটের রানওয়েটি টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে নজরে পড়ে না ; মাঝখানে শ'দুয়েক ফুট চওড়া রেখে দেওয়া শাল গাছের জঙ্গল। তারই ফাঁক দিয়ে একসময় ড্রাইভের পথে

ডাকোটা প্লেনটি পাখা ঘুরিয়ে গর্জন করতে করতে এসে টার্মিনাল বিল্ডিং-এর অদূরে থামল। চাকা লাগানো সিঁড়িটা প্লেনের দরজার গায়ে লাগিয়ে দেবার পর প্লেনে আসা যাত্রীরা একে একে নেমে পড়ল। এরপর ওনাদের ব্যক্তিগত এবং প্লেনে বয়ে আনা অনেক মালপত্র নামাবার পালা। এটা সাঙ্গ হলে এখান থেকে দমদমগামী মালপত্র প্লেনের মধ্যে তুলে দেওয়া হতে থাকে। সেই সময়টা প্লেনের ডানার ছায়ায় দুপুর রোদে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা। এক সময়ে সংকেত পেয়ে অন্য সকলের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের ভেতরে ঢুকলাম।

প্লেনের মাঝখান দিয়ে করিডর, দুপাশে দুজোড়া করে সীটের ব্যবস্থা। আজ যাত্রীরা কম থাকায়, ডানদিকের সীটগুলোই আছে, আর বাম দিকের সীটগুলো খুলে সরিয়ে ওই দিকে মালপত্র বোঝাই করে প্লেন কোম্পানি লোকসান উসুল করছে। তবে ওনাদের বুদ্ধি বিবেচনার তারিফ করতে হয়। বাম্পিং-এর সময় স্থানভ্রষ্ট হয়ে যাতে আমাদের অসুবিধার কারণ না হয়, সেই জন্যে প্লেনের মেঝে, দেওয়াল ও ছাদের আংটার সঙ্গে ওদের সযত্নে বাঁধা হয়েছে দড়ি দিয়ে।

একসময়ে কেবিনের দরজার মাথায় লাল আলোয় জ্বলে উঠল, চেয়ার বন্ধনী পরুন। প্লেনটি এরপর ট্যাক্সি ড্রাইভ করে রানওয়ের বাম প্রান্তে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে প্লেনের ইঞ্জিন পুরোদমে চালু করলে উত্তরোত্তর গর্জনের সঙ্গে প্লেনটি থরথর করে কাঁপতে থাকল। প্লেনের চাকা দুটো তখন ব্রেক করা ছিল। চাকার ব্রেক খুলতেই প্লেনটা জ্যা-মুক্ত তীরের গতিতে এগিয়ে চলল। কিছু পরে চাকার সঙ্গে মাটির ঘর্ষণের ধ্বনি বন্ধ হলে টের পেলাম, প্লেনটি আকাশে উঠেছে। পরের পর কয়েকটা ঝটকা দিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে প্লেনটি সাদা মেঘের রাজ্যে উঠে এল।

বেশীর ভাগ মেঘ এখন আমাদের পায়ের তলায়। মেঘের

ফাঁকে অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে গাঢ় সবুজ চাষের খেত, হালকা সবুজ ফাঁকা মাঠ আর খেয়াল খুশি মত বিচিত্র ভঙ্গীতে রেখায়িত নদীর গতিপথ। লোকালয় হাট, বাজার ও গঞ্জ চেনা যায় গাছে ঘেরা ছোটখাট জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট বাড়ির টিন ও খড়ের চাল দেখে।

আধঘণ্টা এই ভাবে যাবার পর শুরু হল পায়ের তলায় মেঘের সমুদ্র। এই সমুদ্রের যেন শেষ নেই। মেঘ সমুদ্রের ওপরটা ঢেউ খেলানো অসমান। কখনও মনে হয় ফুলকপির ফুলগুলো পাশাপাশি কেউ সাজিয়ে রেখেছে। সমুদ্রে মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাস হয়, মেঘ সমুদ্রেও তার অভবাব নেই। দু চার জায়গায় টিলার মত মেঘ যেন ওপর দিকে ফুঁসে উঠেছে। মাটির ওপর টিলার তলাটা মোটা, ওপরদিকটা ক্রমশ সরু। মেঘের টিলার ক্ষেত্রে কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। কখনও বড় ফোয়ারার মত কখনও বা চারপাশে হেলে পড়া বাঁশঝাড়ের মত এই সব টিলার অপার্থিব রূপ।

ডাকোটা প্লেনটি মেঘ-সুদ্রের ওপর দিয়েই উড়ছে। তবে কয়েক জায়গায় দু চারটে মেঘের পাহাড় এত উঁচুতেও পথরোধ করে দাঁড়ায়। প্লেনটিকে তখন বাধ্য হয়ে এই মেঘ-পাহাড়ে ঢুং মেরে, এগোতে হয়। প্লেনের যাত্রীদের তখন বিপত্তি। জলীয় বাষ্পে ভরা বর্ষার মেঘ আশপাশের বাতাসের থেকে ঘনত্বে কম। সেই কারণে প্লেনটিকে একই উচ্চতায় রাখা পাইলটের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই মুহূর্তে প্লেনটি হয়ত পনের ফুট ওপরে উঠে গেল, তার পর মুহূর্তে তিরিশ চল্লিশ ফুট হুহু করে নিচে নেমে যাবে, লিফটে দ্রুত নামার অনুভূতি দিয়ে। প্লেনের ভেতরে হঠাৎ নেমে আসে ম্লান অন্ধকার, ককপিটের পেছনে লাল আলোয় জ্বলে ওঠে, "চেয়ার বন্ধনী পরুন", আর মোটা কাঁচের জানলার বাইরে তখন দেখা যায় ঝোড়ো কুয়াশার তাণ্ডব। অনেকে এই

অবস্থায় বেসামাল হয়ে গিয়ে বমি করতে থাকে। ইংরাজিতে এটাকে বলা হয় এয়ার সিকনেস। কিন্তু এর বাংলা প্রতিশব্দ বায়ুরোগ জানালে কবিরাজেরা আপত্তি করবেন নিশ্চয়।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ এই মেঘ-সমুদ্র পার হয়ে আমরা এলাম খণ্ড খণ্ড মেঘের রাজ্যে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অনেক নিচে নজরে পড়ে নদীয়া জেলার জলঙ্গী ও চূর্ণী নদী। কিছু পরে দেখতে পেলাম ভাগীরথী নদী ও নৈহাটির উপকণ্ঠে জুবিলি ব্রীজ। প্লেনটি এর পর অনেকটা নেমে আসায় কল্যাণী টাউনশিপের সাজানো রাস্তাঘাট ও বাড়িগুলো ছবির মত লাগল। একেবারে পশ্চিম দিগন্তে ভাগীরথীর ওপারে ব্যাণ্ডেলের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি তিনটে চিমনি থেকে মৃদু-মন্দ ধোঁয়া বের হচ্ছিল।

কল্যাণী থেকে দমদম আসতে মিনিট দশেকের বেশি লাগেনি। নিচে নজরে পড়ে অসংখ্য ডোবা, পুকুর ও নারকেল গাছ ; এছাড়া মাঝে মধ্যে ইঁটের ভাটা, আর ছোট ছোট সবুজ মাঠের মধ্যে উই পোকার আকারে গরুর পাল। একটা পিচ ঢালা রাস্তা নজরে এল ; পর পর দুটো গরুর গাড়িকে অতিক্রম করে একটা খেলনার মত বাস এগিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ পথে আমরা অনায়াসে সেই বাসটিকে অতিক্রম করে যখন দমদম বিমান বন্দরের কাছাকাছি চলে এলাম, ককপিটের পেছনে লাল আলোয় জ্বলে উঠল, চেয়ার বন্ধনী পরুন।

কিছুক্ষণ বাদে নারকেল গাছের সারিকে প্রায় ছুঁয়ে ডাকোটা প্লেনটি রানওয়ের ওপর নেমে এল। সামান্য একটি ধাক্কা, তার পরে আর একটি। বুঝতে পারলাম প্রথমে সামনের দুটো ও পরে পেছনের একটি চাকার ওপরে প্লেনটি ভূমি স্পর্শ করল। রানওয়ের সঙ্গে চাকার পরিচিত ঘর্ঘর শব্দে অজান্তে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বের হল।

প্লেনটি ক্রমশ গতি মন্থর করে রানওয়ের এক প্রান্তে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর প্লেনটি ওই প্রান্ত থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভ করে ঘুরে ধীরে ধীরে আট নম্বর হ্যাঙ্গারের সামনে এসে এক সময় থেমে গেল। প্লেনে দরজাটি পেছন দিকে থাকায় নামার ব্যাপারে পেছনে বসা যাত্রীদের অগ্রাধিকার। ওদের পেছনে গিয়ে প্লেনের দরজায় লাগানো চাকা ওয়ালা সিঁড়ি বেয়ে যখন দমদমে নামলাম, ঘড়িতে তখন তিনটে বাজে।

প্রাপ্তিস্বীকার ॥ পত্রপত্রিকা

নিম্ন দামোদর বার্তা ☐ আশিস সাহা। আরামবাগ, হুগলী। পাক্ষিক পত্রিকা। দেড় টাকা।

এবং প্রেক্ষণ ☐ সুদীপা বসু। স্কুল রোড, কান্দি, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৩৭ প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। দু টাকা।

মুরারিপুকুর সংবাদ ☐ বঙ্গজিৎ দাশ। বর্ষ ৬, সংখ্যা ৬। ১৪ মুরারি পুকুর রোড, কলিকাতা-৬৭, দু টাকা।

শারদীয়া সাহিত্য চিন্ময়ী ☐ অভিজিৎ ব্যানার্জী। সপ্তম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৪০৭ অমূল্য ম্যানসন, স্যুট নং ২, ৫৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬, ১৫ টাকা।

শারদীয়া আগমনী ☐ অভিজিৎ ব্যানার্জী। উদ্বোধন সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০৭ পাঁচ টাকা।

কলকাতা সংবাদ ☐ অভিজিৎ ব্যানার্জী। ১০ আশ্বিন ১৪০৭, দু টাকা।

অনন্য বনফুল ☐ চিত্তরঞ্জন দাস। শারদ অর্ঘ ১৪০০, পাঁচ টাকা।

শারদীয়া পূর্বাশা ☐ শুভংকর রায় চৌধুরী। ১৫ বর্ষ। রেল্ট ক্যাম্প পাণ্ডু, গুয়াহাটি ৭৮১০১২, অসম। দশ টাকা।

সমকণ্ঠ ☐ সিদ্ধেশ্বর শেঠ। প্রবন্ধ সংখ্যা, জুন ২০০০, চতুর্দশ বর্ষ। ১/৬, কণিষ্ক রোড, দুর্গাপুর ৭১৩১০৪। ১৫ টাকা।

জয়তু বিদ্যাসাগর দেবাশিস্ গুহ

কিছু দিন আগে এই একবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২০০০ সালের নতুন মিলেনিয়ামে বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব, মুক্ত মনের আলোর দিশারী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালিত হল। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন এই ২০০০ সালে যেভাবে পাড়ায় পাড়ায় নানান সাহিত্য সভায় বিশাল আড়ম্বরের সাথে পালিত হল, সেইভাবেই উচিত ছিল এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করা। কেন না ইনি ছিলেন একাধারে বাংলা সাহিত্যের জনক, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিদ্রোহী, প্রগতি-শীল সমাজ সংস্কারক আবার ছিলেন মানবতা ও স্নেহের মূর্ত প্রতীক দয়ারসাগর।

যখন আমি এই মহাপুরুষকে স্মরণ করি, আমার মনের কোণে এই চিন্তা উঁকি মারে যে পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতার নায়কের তেজোদৃপ্ত উক্তি 'বল বীর চির উন্নতমম শির' একমাত্র বিদ্যাসাগর বীরের মুখেই শোভা পায়। কেননা তার ক্ষেত্রে এই উক্তি—বহুলাংশে সার্থক। উনি ছিলেন চির উন্নত শির মহাপুরুষ।

মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে মহাকবি ভবভূতির বিখ্যাত উক্তি বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি' বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য। তাই দেখি এই চির উন্নত শির বজ্রকঠিন মহাপুরুষ, আবার দয়ার সাগর, মানবদুঃখ লাঘবে সদাতৎপর যেন মর্তে দয়াল হরি।

বাংলা ভাষার সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগরের অবদান

অপরিমেয়। তিনি সংস্কৃতবহুল সেকালের দুর্বোধ্য বাংলা ভাষাকে ভেঙ্গেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে তার মধ্যে সজীব প্রাণের সঞ্চার করে বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ও মনোহারী করেছিলেন। বাংলা বর্ণপরিচয় লিখে উনি বাংলাভাষা শিক্ষার সার্থক সোপান রচনা করেছিলেন। উনি আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে সর্ব-স্বীকৃত। বিস্ময়ের বিষয় তার সহজ সরল বাংলায় লেখা 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শিশুমনকে গভীরভাবে দোলা দিয়েছিল। এই দুটি লাইনের মধ্যে ছন্দের দ্যোতনা ও কবিতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ আছে। এক এক সময় মনে হয় এই দুটি লাইন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিনি কবিতা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এই দুটি ছন্দময় কবিতার যাদু আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে মনে হয় ইনি আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক তো নিশ্চয় উপরন্তু সহজ সরল বাংলা মিনি কবিতার জনক হয়েছেন। তবে তিনি কোনো ভাষাকে অনাদর করতেন না। সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষা ভালই জানতেন। ইনি যেমন বাংলা বর্ণপরিচয় লিখে বাংলা ভাষা শিক্ষার সার্থক সোপান রচেছিলেন, তেমন ধারা ব্যাকরণ কৌমুদী লিখে সংস্কৃত শিক্ষার এক সুন্দর সোপান গড়ে ছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। ইনি বুঝেছিলেন 'কূপমণ্ডূক' হলে চলবে না। দেশবাসীকে মাতৃভাষার সাথে সাথে ইংরাজীও শিখতে হবে। তাই ইনি ভারতহিতৈষী ইংরেজ বেথুন সাহেবের সহায়-তায় ও সেকালের ইংরেজ সরকারের সাহায্যে তৎকালীন বাংলা প্রদেশে অনেক স্কুল স্থাপন করেছিলেন। যেখানে বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষাই পড়ান হত। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া সত্বেও ইনি কোনোদিন ইংরাজী বেশভূষায় সজ্জিত হননি।

বাঙ্গালীদের বেশভূষা—অর্থাৎ ধুতিচাদর পরিহিত হয়ে সাহেবদের বুটজুতা না পরে চটি জুতায় শোভিত হয়ে সেকালের শিক্ষিত ইংরেজ মহলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, ভারতীয় স্বদেশীআনার জ্বলন্ত প্রতীক হিসাবে।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের হৃদয় সেকালের অনেক হিন্দু বিধবাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে অতিশয় উদ্বেলিত হয়েছিল। প্রতিকারের জন্য সেকালের রক্ষণশীল সমাজের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করলেন হিন্দু বিধবাদের বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয় ও তাকে আইনসিদ্ধ করেন। ইংরাজ সরকারের সহায়তায় হিন্দু বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। যখন কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সে ঋণভারে জর্জরিত, বাড়িভাড়া না দেওয়াতে বাড়ীওয়ালা তাকে উচ্ছেদ করতে তৎপর, তখন ভারতবর্ষে একমাত্র 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর ফ্রান্সে টাকা পাঠিয়ে কবিকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর জীবনে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছিল। সবগুলি এ স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। সেখানে দেখা যায় এবং বোঝায় এই মহাপুরুষ চাইতেন যে কোনো মানুষের দুঃখ লাঘব করতে ও উপকার করতে। কবি চণ্ডীদাসের মহান উক্তি 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' ইনি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করতেন। জীবনের শেষের দিকে ইনি অনেক সময় কাটাতেন বিবহারের (অধুনা ঝাড়খণ্ডের) কারমাটারে সমাজের অবহেলিত ও দুঃস্থ মানুষের সেবা করতে।

গত চোদ্দশোসালের প্রারম্ভে, তাঁর জন্মদিনে তাঁর পর-হিতৈষনার একটি বহুকথিত ঘটনা হঠাৎ আমার মনের কোনে উঁকি মেরেছিল এবং জাগিয়েছিল তাঁর প্রতি এক সশ্রদ্ধ ভাবাবেগ এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ লিখেছিলাম তাৎক্ষণিক এক কবিতা ঃ

মালপত্র নিয়ে যুবক স্টেশনে আর্তস্বরে ডাকে কুলি কুলি
হয়ে বিগলিত বিদ্যাসাগর মহারাজ সাজলেন মালবাহী কুলি।
সহাস্যে সেদিন মালপত্র নিয়ে যান যুবক গৃহে চটপট,
পরে উধাও সেখান হতে, দিয়ে চিরতরে চম্পট।
এস এস ভাই অবনত শিরে এ মহাপুরুষকে স্মরণ করি
দুঃখ লাঘবে সদাতৎপর, দয়ারসাগর, মূর্তদয়াল হরি।

আজকের দিনে এই একবিংশ শতাব্দীতে, যখন দেখি সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার মধ্যদিয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা হচ্ছে, তখন আলোর দিশারী এই মহাপুরুষের জন্মদিন উদযাপনের বিশেষ তাৎপর্য উপলবদ্ধি করা যায়।

আমার একটি মনের সাধ ছিল যে এ কলকাতা সহরে ৩৬ নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে ১৮৭৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের বাসের জন্য যে দ্বিতল বসত বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন সেই গৃহ যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার নামে এক বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। সে ইচ্ছা পূরণ করেছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ২০০০ সালের নতুন মিলেনিয়ামে প্রথম জন্মদিনের পালনের মধ্যদিয়ে। এর জন্যে মন্ত্রী সত্যসাধন চকবর্তীকে সাধুবাদ জানাই।

তবে শুধু জন্মদিন পালনের মধ্যদিয়ে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না। এই সমাজ সংস্কারের বৈচিত্রময় জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা বর্জন করে মহান মানবতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের মহান ঐতিহ্যকে আরো মহীয়ান করতে হবে। বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেবের ভাবধারায় প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদ ও পশ্চিমের ভোগবাদের সুসংমিশ্রণ ঘটিয়ে অতিশয় সুন্দর মানবজীবনকে আরো সুন্দর করতে হবে, কেননা প্রতিটি মানুষ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দেবমনুযুক্ত অমৃতের সন্তান।

এনোক আর্ডেন (টেনিসন)

ভাষান্তর—ধরিত্রী চক্রবর্তী

পাঁচ

এখন মৃত লোকটি জীবনে ফিরে এসে যখন দেখল, তার স্ত্রী আর তার নয়, তার স্ত্রীর শিশু সন্তানটি, সে তার পিতার কোলে, সেই শিশু সন্তানটির পিতা সে নয়, সেই মৃত লোকটির ছেলে-মেয়েদের ভালবাসা, সংসারের কর্তৃত্ব,—সবই সেই অন্য আর এক জনের অধিকারে, (মিরিয়াম লেন যদিও তাকে সব কিছু বলে-ছিল, তবুও শোনা কথার চাইতে চোখে দেখা দৃশ্য অনেক বেশী হৃদয় বিদারক) তখন তার মাথা ঘুরতে লাগল আর পা টলতে লাগল। তাড়াতাড়ি সে গাছের ডালটা ধরে ফেলল, তার ভয় হোলো যদি সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের সমস্ত সুখ শান্তি ভূমিকম্পের মতো চুরমার করে দেবে। সে চোরের মত পা টিপে টিপে ফিরে এল, পাছে পায়ের নীচে নুড়ি পাথরে কোনও শব্দ হয়। বাগানের দেওয়াল ধরে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল, যদি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়, আর কেউ তাকে দেখেফেলে। প্রায় চারহাতেপায়ে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেল, বেরিয়ে এসে, যেমন রুগীর ঘরের দরজা লোকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দেয়, সেই রকম ভাবে গেট বন্ধ করে দিয়ে এসে বাইরের জমিটাতে গিয়ে দাঁড়ালো। অশক্ত দুর্বল হাঁটু নিয়ে নতজানু হতে পারলনা, একেবারে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মাটি আঁকড়ে ধরলো, আর প্রার্থনায় ভেঙ্গে পড়লো,—'হে ঈশ্বর, হে সর্বশক্তিমান, এ যে সহ্যের অতীত। কেন ওরা আমাকে ওখান থেকে নিয়ে এল! হে রক্ষাকর্তা, ঐ নির্জন দ্বীপে যেমন তুমি

আমাকে সাহায্য করেছিলে, সেই রকম ভাবে আরও কিছুদিন আমাকে একাকীত্ব থেকে বাঁচাও! আমাকে সাহায্য কর, বল দাও যাতে আমি তার শান্তির জীবন নষ্ট করে না দিই! কিন্তু, আমার ছেলে-মেয়েরা, আমি কি তাদের সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারব না? তারা তো তাদের বাবাকে জানেও না! তাহলে কি, আমি আমার কাছেই বিশ্বাসহন্তা হব? না, কখনো না! এমন সুন্দর ছেলেটা আর মাতৃমুখী মেয়েটার জন্য পিতার চুম্বন,—না, তা আমার ভাগ্যে নাই। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলা ও চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেললো, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রইল। কিন্তু যখন সে উঠে তার নির্জন ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো, যতক্ষণ সেই সরু, দীর্ঘ রাস্তাটা দিয়ে হাঁটল, ততক্ষণ যেন গানের ধুয়োর মত তার ক্লান্ত মাথায় অবিরত এই ঘা দিতে লাগলো—"তাকে কখনও বলবনা, তাকে কখনও জানতে দেবনা।"

সে কিন্তু সম্পূর্ণ অসুখী হয়নি। লবণাক্ত সমুদ্রে মিষ্ট জলের ঝর্ণার মত পৃথিবীর সমস্ত তিক্ততাকে ছাপিয়ে তার এই নিরন্তর প্রার্থনা ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করল, তার আত্মিক মৃত্যু ঘটালনা। মিরিয়মকে সে জিজ্ঞাসা করলো, "এই যে মিলারের স্ত্রী, যার কথা তুমি বলেছ. তার কি এ ভয় নাই যে, তার স্বামী আবার ফিরে আসতে পারে?"

"হায় বেচারি, ভয়? আমার তো মনে হয়, যথেষ্ট ভয় আছে। তুমি যদি তাকে বলতে যে তুমি এনোককে মরতে দেখেছ, তাতেও বেচারির একটু শান্তি, একটু স্বস্তি হোতো।"

এনোক তখন মনে মনে ভাবল, 'ঈশ্বর আমাকে নিলে, সে জানতে পারবে। আমি তাঁর ডাকের অপেক্ষায়ই আছি।"

মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কাজকর্ম আরম্ভ করল, কারণ সাহায্যের উপরে বেঁচে থাকতে সে চায়না। সে সবরকম কাজই

জানতো; পিপে ইত্যাদি তৈরী করা, ছুতোরের সব রকম কাজ, জেলেদের জাল বোনা ও মেরামত করা, লম্বা মালাবাহী জাহাজগুলোর মাল উঠানো নামানো ইত্যাদি কাজে তার যা প্রয়োজন তা কোনও রকমে হয়ে যেত। কাজ সে শুধু নিজের সামান্য প্রয়োজনে করত, একাজের পেছনে কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা ছিলনা, যা মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এই ভাবে কাজ করতে করতে বছর এল ঘুরে। এল সেই দিন যেদিন এনোক এসেছিল ফিরে। তার শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লো, আর একধরণের জড়তা তাঁকে ঘিরে ধরলো। তার পর আর কাজে বেরোতে পারলনা, বাড়ীতেই রয়ে গেল। তারপর সে চেয়ারে বসে কিছুদিন কাটালো, অবশেষে শয্যা নিল। এই দুর্বলতা, এই শয্যাশায়ী হয়ে পড়া, এনোক কিন্তু সানন্দেই গ্রহণ করল জাহাজডুবি হয়ে সমুদ্রে আটকে পড়া এক নাবিক (যে নাকি তার জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিল) যেমন আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, কুয়াসার ধূসরতা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নৌকা আসছে তাঁকে বাঁচানর জন্য, ঠিক সেই রকম আনন্দের সঙ্গে সে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেল। আর বুঝতে পারল, সব শেষ হয়ে আসছে। সেই মৃত্যুর পদধ্বনির মধ্যেও একটি আশার আলো জ্বলছিল, আমার মৃত্যুর পর সে জানতে পারবে, আমি তাঁকেই শেষ পর্যন্ত ভালবেসেছিলাম।" এই কথা ভেবেই সে মিরিয়মকে চেঁচিয়ে ডাকলো।

মিরিয়াম এলে সে বললো, আমি তোমাকে কিছু বলার আগে, বাইবেল ছুঁয়ে শপথ কর যে, যা বলব তা আমার মৃত্যুর আগে প্রকাশ করবে না।"

"কি বলছ গো? তুমি মরবে? আমরা তোমাকে মরতে দিলে তো? ঠিক সারিয়ে তুলব।"

এনোক কঠোর ভাবে শুধু বললো, "বাইবেল ছুঁয়ে শপথ কর।"

—মিরিয়াম ভয় পেয়ে বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করল।

"এই বন্দরের এনোক আর্ডেন কে তুমি চেন ?"

"চিনি, মানে, অনেক কাল আগে চিনতাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে, পড়েছে, তাকে দেখতাম রাস্তা দিয়ে নেমে আসছে, মাথা উঁচু করে, কাউকে গ্রাহ্যই করতনা, এমন ভাবে চলত।"

এনোক তখন খুব ধীরে ধীরে করুণ ভাবে বলল, "তার মাথা এখন নীচু হয়ে গেছে, পৃথিবীর কেউই তাকে গ্রাহ্য করে না। আমি আর দিন তিনেকের বেশী বাঁচবনা, আমিই এনোক।"

এই শুনে মিরিয়াম অর্দ্ধেক বিশ্বাসের মধ্যে হিস্টিরিয়ারুগীর মতো চিৎকার করে বলল, "তুমি এনোক হতেই পারো না, সে তোমার চেয়ে আরো একফুট লম্বা ছিল।"

এনোক উত্তর দিল, "আমার ঈশ্বরই আমার মাথা নত করে দিয়েছেন। আমার দুঃখ আর নিঃসঙ্গতা আমাকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। যাই হোক, আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম, সে ফিপিকে বিয়ে করেছে। বোসো এখানে, শোনো।"

তার পর সে তার সমুদ্রে যাত্রার কথা, জাহাজডুবি হওয়া, দ্বীপে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা, ফিরে আসা, অ্যানির সংসার লুকিয়ে দেখা, তার প্রতিজ্ঞার কথা, সব একে একে বলল। শুনতে শুনতে মিরিয়ামের চোখের জলে বুক ভেসে গেল, তার পর ইচ্ছা হোলো, ছুটে গিয়ে সবাইকে এনোকের কথা আর দুঃখের কথা বলে বেড়ায়। কিন্তু সে যে বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করেছে !! সে শুধু বললো, "মরার আগে তোমার ছেলে মেয়েদের একবার দেখবে না ? যাই, আমি তাদের নিয়ে আসি", বলে উঠে দাঁড়ালো। এনোক তার কথায় মুহূর্তে কাল চিন্তা করে বলল, 'দেখ মেয়ে, মরার আগে আমাকে আর বিচলিত কোরো না, আমি যা স্থির করেছি, করতে

দাও। বোসো, আমাকে লক্ষ্য করে বুঝতে চেষ্টা করো, যতক্ষণ আমার কথা বলার ক্ষমতা আছে। তোমার উপর কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। যখন তার সঙ্গে দেখা হবে, বলো তাকে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাকে ভাল বেসেছি, আর আশীর্বাদ করেছি, প্রার্থনা করেছি তার জন্য। তার আর আমার মধ্যে রইল খালি একটাই বাধা, সেটা যখন থাকবেনা, যখন আমার পাশে রাখবে তার মাথা, তখনও বাসব ভালো তেমনি করে। বোলো আমার মেয়ে অ্যানিকে, সে তার মায়েরই প্রতিচ্ছবি, যে আমি তাকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আশীর্বাদ করেছি ও তার জন্যে প্রার্থনা করেছি। আমার ছেলেকে বোলো আমি তাকেও আশীর্বাদ করেছি। আর বোলো ফিলিপকে, তাকেও আমি করছি আশীর্বাদ, আমাদের ভালো ছাড়া কখনও খারাপ সে চায়নি। মৃত্যুর পর যদি আমার ছেলেমেয়েরা দেখতে চায়, দেখুক। কারণ, বাবা হিসাবে তারা তো আমাকে চেনেই না। কিন্তু তাকে কখনই আমার মৃতমুখ দেখতে দিওনা, কারণ সেই দৃশ্যের স্মৃতি তার পরবর্তী জীবনে ডেকে আনবে অশান্তি। এখন, আমার মৃত্যুর পর একজনই আছে, যে আমাকে মৃত্যুর পর জড়িয়ে ধরবে। এই চুলের গোছা তার, এটা তার মা-ই কেটে আমার সঙ্গে রাখতে দিয়েছিল। আর, এতবছর ধরে, এটা আমি সঙ্গে রেখেছি, আর ভেবেছিলাম, এটা আমি কবরে নিয়ে যাব। এখন আমার মনের পরিবর্তন হয়েছে, কারণ এখন আমি তার দেখা পাবো। আমার শিশু সন্তান পরম সুখে আছে। সেজন্য আমার মৃত্যুর পর তাকে এটা দিও, হয়তো সে একটু সান্ত্বনা পাবে। তাছাড়া, আমিই যে এনোক সেটাও তো প্রমাণ করবে।"

সে চুপ করল। মিরিয়ামলেন সবই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে শপথ করলো। এনোক আবার তাকে প্রতিটি কথা স্মরণ করিয়ে দিল, মিরিয়াম আবার শপথ করল। এর পর তৃতীয় রাত্রে

এনোক নিশ্চল অবস্থায় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, আর মিরিয়াম তাকে পাহারা দিতে দিতে মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়েছিলো। সেই সময়ে সমুদ্রে এমন প্রচণ্ড গর্জন শুরু হোলো যে সব বাড়ীগুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এনোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'একটা মাস্তুল। ঐ যে একটা মাস্তুল দেখা যাচ্ছে! আমি বেঁচে গেলাম!' তারপর সে শুয়ে পড়ল, আর কথা বলল না।

দৃঢ়চিত্ত, সাহসী আত্মাটি চলে গেল। সেই শেষ যাত্রার সমারোহ ছোট বন্দরটি এর আগে আর কখনও দেখেনি।

সমাপ্ত

প্রাপ্তিস্বীকার ॥ পত্রপত্রিকা

শারদীয়া সংঘসাথী ☐ মৈত্রেয়প্রতিম বড়ুয়া। ৬২ বর্ষ, ১৪০৭। ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬, ৩০ টাকা।

অনন্য নান্দনিক ☐ অমলকান্তি দলুই। শারদ অর্ঘ ১৪০৭, ২২/১, বাখরাহাট রোড, কলিকাতা—৭০০০৬৩, পঁয়ত্রিশ টাকা।

বিশ শতক ☐ মায়া চট্টোপাধ্যায়। ৫ ডাঃ অক্ষয় পাল রোড, বেহালা। কলিকাতা-৩৪, ১৫ টাকা।

অনুপথী ☐ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও দীপালি চট্টোপাধ্যায়। বর্ষ ৫, সংখ্যা ৭। সুভাষপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম ৭৩১১০১, দামের উল্লেখ নেই।

উত্তরপক্ষ ☐ রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ডি-৪৩, সারদা পার্ক, ঘোতশিরামপুর, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩৫২, শারদীয়া ১৪০৭, পাঁচ টাকা।

এখন গল্পের কাগজ ☐ দেবব্রত মল্লিক। ২ সেলিমপুর লেন, কলকাতা-৩১, ১৫ টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলন। বইমেলা ২০০০। গ্রীষ্ম বর্ষা ২০০০

বুলবুল ☐ এস, এম, সিরাজুল ইসলাম। ৬, মৌলতী লেন, কলকাতা ১৬, আগস্ট ২০০০, সাত টাকা।

ওরা দোতলার
লীনা সেন

দিদি। ডাক শুনে কুন্তি ওপরের দিকে তাকাল। উঠোনে দড়িতে ভিজে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল। ওপরে দোতলার জানলার গরাদে হাত রেখে সুধা বলল, রান্না হয়েছে? মেয়েরা স্কুলে গেছে?

ঘাড় নাড়ল কুন্তি। এতে রান্না হয়ে খাওয়া, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া দুটোই বোঝায়। রোজ এই সময় এই নির্জন দুপুরে ওপর নিচ এভাবে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। এই সময়টাই কুন্তির অবসর। নইলে সকাল থেকে তার নিঃশ্বাস ফেলার সময় হয় না। স্বামী বিপ্লবকেতন সকাল সাড়ে নটায় অফিসে যায়। সঙ্গে টিফিন। তার বেরুবার সময় হাতে রুমাল, চিরুনী এগিয়ে দিতে হবে। এমন কি কৌটো খুলে বানান পানও। এরমধ্যে নবম শ্রেণীর সাড়ে চৌদ্দ বছরের মেয়ে পান্না ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডাকবে, মা আমার ইরেজারটা দেখেছ? জ্যামিতি বক্সে নেই কেন, মা আমার প্র্যাকটিক্যাল খাতা লাগবে। এ থামল তো সিক্সে পড়া বারো বছরের নর্মদা ডাকবে, মা রুটি বানালে আমাকে দিয়ে যাবে। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ও মা আমার স্কুলের ইউনিফর্মটা কি কমলাদি কেচেছে?

বড় মেয়ে শক্তি তো সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে যায়, কোথায় গিয়ে যেন কম্পিউটার শিখছে। তাছাড়া ইন্সুরেন্সের এজেন্সি করে। সারা দুপুর ঐ কাজে ওর কেটে যায়। ফেরার সময়ের ঠিক থাকে না। কোন কাজে মেয়েদের সাহায্য সে পায় না। ঠিকে ঝি মলিনা তো ঘড়ি ধরে সাতটায় আসে, আটটায় চলে যায়। শুধু বাসন মাজা, ঘর মোছা, কাপড় জামাও কেচে রেখে যায়। ওর আর সময় হবে নাকি। আরও ছ'বাড়ি ওর কাজ বাকি। এর মধ্যে ও শুনিয়ে গেছে, পুজোর পর টাকা না বাড়ালে ও কাজ করবে না।

ওর কথায় রেগে গিয়ে কুন্তি বলেছিল, ওকে আর রাখব না। বাসন মাজা, কাপড় কাচা ছাড়া ওকে দিয়ে আমার আর কোন উপকারটা হয়?

শক্তি মাকে বুঝিয়েছে, মলিনাদি যতটুকু কাজ করে ততটুকুই তোমার উপকার।

কুন্তি চুপ করে যায়, মেয়ের কথা তাকে মেনে নিতে হয়।

অন্যদিকে দোতলার সুধার সকালবেলার কোন দায় দায়িত্ব নেই। সমরেন্দ্র মল্লিক আরবে কাজ করে। এখানে থাকে সুধার ষাট বছরের শাশুড়ি প্রীতিকণা। আর শক্তির বয়সী কলেজে পড়া মেয়ে ভক্তি। এই তিনজনের জন্য দু'জন কাজের লোক। তাদের দেখাশোনা করে প্রীতিকণা। তবে মুক্তি কলেজে না যাওয়া পর্যন্ত সুধাকে হিমসিম খাইয়ে ছাড়ে। সকাল থেকে কতবার যে মুক্তি মাকে ডাকছে, মা আমার ডাইরীটা পাচ্ছি না কেন? মা আমার পড়ার টেবিলটা গুছিয়ে রেখো তো।

মেয়ে খেতে বসবে, তাকে মাছ বেছে দাও। ভাত গরম। হাওয়া দিয়ে ঠাণ্ডা করে দাও। চুল আঁচড়ে দাও। মা কোন শাড়ি পরব, শাড়ির কুচি ঠিক করে দাও।

ভক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রীতিকণাও কম যায় না। ভক্তি থামল তো প্রীতিকণা ডাকছে, ও বৌ নকুলদানার শিশিটা দেখেছিস? ও বৌ পেতলের পিদিমটা বার করে দিস না—ও বৌ মাজতে হবে। ভক্তি বেরুলে প্রীতিকণা বাজারের ব্যাগ নিয়ে বার হয়। বাজার ছাড়া কত কেনাকাটা থাকে তার! তার মধ্যে পান জর্দা, পুজোর ফুল। প্রীতিকণা বেরুলে সুধা নিশ্চিন্ত বোধ করে। তখন এসে সে জানলায় দাঁড়ায়।

সমরেন্দ্র বহুবছর বিপ্লবকেতনের দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল তখন সে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ফিটারের কাজ করত। সংসারে মা আর দু'জন অনুঢ়া বোন ছিল। এ বাড়িতেই সুধা

বৌ হয়ে এল। অন্যদিকে বিপ্লবকেতনের বুড়ো মা বাবা আর স্ত্রী কুন্তি। বিপ্লবকেতন মহাকরণের কর্মী। যে বছর শক্তি জন্মাল সে বছর ভক্তিও জন্মাল। প্রীতিকণা শক্তির সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাতনির নাম ভক্তি রাখল। ছোটবেলায় শক্তি ভক্তি দুজনে এই উঠোনে কত খেলেছে। ভক্তির সাত বছর বয়সে সমরেন্দ্র আরবে চাকরি নিয়ে চলে গেল। ছুটিতে বছরে সে একবার এসে মাস দুয়েক থেকে যায়। সঙ্গে অনেক টাকা নিয়ে আসে। সে টাকায় পাশের বাড়ির ছাত কিনে সেখানে দোতলা করল। দু' বোনকে বিয়ে দিল। ঘরদোর দামি আসবাবপত্রে সাজাল। নতুন কিছু কিনলেই সুধা এসে কুন্তিকে নিয়ে গিয়ে তা দেখায়। ষোল বছরেও বাড়িই শুধু বদলায় নি, বদলেছে কলেজে পড়া মেয়ে মুক্তিও। সে এখন এ বাড়ির কাউকেই চিনতে চায় না। এমন কি শক্তিতেও নয়। তিন তিনবার ফেলের পর মাধ্যমিক পাশ করেছে। তাও সব সাবজেক্ট আলাদা আলাদা মাস্টার ছিল। এই নাতনিকে নিয়ে প্রীতিকণার খুব গর্ব।

কুন্তির সংসারে কিছুই বদলায় নি। বরঞ্চ সংসারে আরও দুটো মেয়ে এসেছে। পান্না, নর্মদাকে শ্বশুর শাশুড়ি কেউ দেখে যেতে পারে নি। বিপ্লবকেতন ক্যাশিয়ার হয়েছে। তাই তার ধাড়ি ফিরতে রোজই রাত হয়। তার মাইনে কিছুটা বাড়লেও দিন দিন জিনিস পত্রের দাম বেড়ে ও টাকায় তার সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে কুন্তিকে।

কুন্তি নতুন বৌ হয়ে এসে সেই থেকে ৩৬ নম্বর রামসদয় দত্ত লেনের চারদেয়ালে বন্দি হয়ে আছে এই পঁচিশ বছর ধরে। শুধু হেঁসেল ঠেলে, অফিস স্কুলের ভাত বেড়ে দাও। বিকেলে মেয়েরা ফিরলে ওদের সামনে খাবারের ডিস এগিয়ে দাও।

দুপুরবেলাটাই তার অবসর। টিভি বা গলপের বইয়ে তার নেশা নেই। তারচেয়ে সুধার সঙ্গে সুখ দুঃখেয় গলপ করে মনটা হালকা করা যায়।

সমরেন্দ্র ছুটিতে এসে মেয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু করে দিল আজ বর্ধমান, কাল ব্যারাকপুর, পরশু বারাসত—যেখানে পাত্রর খোঁজ পাচ্ছে সেখানেই ছুটছে। মেয়ের বিয়ে না দিয়ে সে এবার আরবে ফিরবে না ঠিক করেই রেখেছে। দুমাস ছুটোছুটির পর দুর্গাপুরের ছেলে ঠিক হল। ছেলেটা একটা ফ্যাকটরীতে কাজ করে। বিয়ের জিনিসপত্র কেনাকাটা আরম্ভ হল। কাঁসা, স্টেনলেসের দু'সেট বাসন, সোনা, জরোয়ার গহনা। ঘর সাজিয়ে আসবাবপত্র। যে জিনিস পছন্দ হচ্ছে সেটাই সে কিনছে। একটা মাত্র মেয়ে তাকে কোন কিছু দিতে কার্পণ্য করছে না। এসব জিনিস দেখাতে কুন্তিকে এসে এসে নিয়ে যাচ্ছে সুধা। ও বলে, দিদি এসব জিনিস তোমাকে না দেখাতে পারলে আমি শান্তি পাই না। তবে কোন জিনিসের কত দাম তা সে বলতে পারে না। মুক্তির বাবা নাকি দর করে জিনিস কেনে না। পছন্দ হল নিয়ে নেয়।

ও বাড়ি থেকে এসে কুন্তি ভাবে, শক্তির জন্য দু' একটা গহনা বানিয়ে রাখলে হত। কুন্তির ভাইরা শক্তির জন্য দু' একটা পাত্রর সন্ধান দিয়েছে। বিপ্লবকেতন সময় করে এখনও ছেলে পক্ষর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। না কুন্তি এবার ভাইদের নিয়ে নিজেই যাবে পাত্রের বাড়িতে।

প্রতিবছর খুব ঘটা করে ভক্তির জন্মদিন হয়। বন্ধুদের নিয়ে কেক কাটে। ক্যাটারার দিয়ে রান্না। খাওয়া দাওয়া, হৈচৈ, হাসিঠাট্টা চলে সারাদিন ধরে। এই অনুষ্ঠানে কুন্তির মেয়েদের নেমন্তন্ন থাকে না। ও বাড়ির নিমন্ত্রিরা চলে যায়। সারাবাড়ি নির্জন হয়ে যায়। কাজ বাড়ে। তখন সুধা নিচে নেমে আসে। উঠোনে দাঁড়িয়ে কুন্তিকে ডাকে। তার হাত জোড়া। থালায় খাবার। কুন্তির হাতে থালা দিতে গিয়ে বলে, মেয়েদের দিও।

সুধা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাগে শক্তি ফেটে পড়ে। বলে ও খাবার তুমি নিলে কেন মা, আমরা কি ভিখারী। মেয়ের উত্তেজিত গলায় কুন্তি ভয় পেয়ে থতমত গলায় বলে কী করব, সুধাকে তো না বলতে পারি না। খাস না—খাবারে চোখ নামায় কুন্তি—চিলি চিকেন, ফিস ফ্রাই দেখে মনে মনে খুশি হয়েই কুন্তি বলে, তোরা এসব খেতে ভালবাসিস বলেই সুধা নিজের হাতে দিয়ে গেল।

মুক্তির বিয়ের দিন যত এগুচ্ছে দোতলায় কুন্তির ডাক ততই বাড়ছে। কুন্তি ছাড়া সুধা যেন চোখে অন্ধকার দেখে। কথায় কথায় সে বলছে, দিদি তুমিই আমার বল ভরসা।

স্ত্রী আচারে কুন্তিকে ডাকছে ওরা। বরণডালা সাজান, পিলসুজে তুলো দিয়ে সলতে পাকিয়ে তাতে তেল দিয়ে সাজাচ্ছে কুন্তি। ফুলশয্যায় কী কী যাবে, ননদ পুঁটুলীতে কী কী থাকবে প্রণামী শাড়িগুলোর গায়ে নাম লিখে কাগজ সেঁটে রাখছে। পানের পিক ফেলতে গিয়ে প্রীতিকণা কুন্তিকে বলল, বৌ তোর মেয়েদের তো একদিনও দেখলাম না। ভক্তির বিয়ের জিনিসগুলো তো দেখে যেতে পারে। তা বিয়ের দিন যেন আসে।

উত্তরে কুন্তি কিছু বলতে পারে না। আসলে বয়স্ক মানুষদেয় মুখের ওপর বলতে পারেনি, বিনা নেমন্তন্নে ওরা আসবে কেন। তবু কুন্তির আশা ছিল, ঠিক নেমন্তন্ন করবে। পাশের বাড়ি বলে সবশেষে করবে। মুক্তির বাবাকেই নেমন্তন্ন করতে আত্মীয় পরিজন, চেনা পরিচিত সবার বাড়ি যেতে হচ্ছে। একটা মাত্র মেয়ের বিয়ে। অবশ্য কুন্তি এ সব ত্রুটি ধরে না প্রীতিকণা নিজে শক্তির বাবাকেডেকে কার্ড দিয়েনেমন্তন্ন করলেও দোষের হয় না।

মেয়েরা মাকে বলেই রেখেছে, ভক্তিদির বিয়েতে আমরা কিন্তু যাব না। যার বিয়ে সে তো আমাদের চেনেই না।

যাস না তোরা। মেয়েদের কথায় রেগে গিয়ে কুন্তি ভেবে ছিল, নেমন্তন্ন কার্ড এ বাড়িতে না দিলেই ভালো।

সমরেন্দ্রর আত্মীয় স্বজন সবাইকে কুন্তি চেনে। সবাই ওকে জিজ্ঞেস করছে, তোমার বড় মেয়ের তো বিয়ের বয়স হয়েছে, সম্বন্ধ দেখছ না কি মেয়ে নিজের পছন্দে বিয়ে করবে?

মায়ের কথা শুনে শক্তি বিরক্ত গলায় বলে বিয়ে ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবতে পারে না দেখছি। তাদের বল, মেয়েরা চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর বিয়ে করবে।

শক্তির যুক্তি মেনে নেয় কুন্তি। দেখছে তো, বাড়িতে যারা আসছে সবার গা ভর্তি গহনা। তাদের মুখে দামি শাড়ির গল্প। বিয়ের দিন বিউটি পার্লার থেকে কী রকম সেজে আসবে, কী শাড়ি পরবে। ছেলেকে নার্সারী স্কুলে পড়ার পেছনে কত টাকা মাইনের মাস্টার তারই গল্প।

রামসদয় দত্ত লেনে 'যোগাযোগ' বাড়িটা একসপ্তাহের জন্য ভাড়া নিয়েছে সমরেন্দ্র। বাইরে থেকে আত্মীয় স্বজন এসে এখানে উঠবে। ভক্তির দু' পিসি একজন আসাম অন্যজন নবদ্বীপ থেকে এ বাড়িতে এসে উঠলেও সকালে চলে আসছে মায়ের কাছে। এসেই বলছে, ওখানে কার কাছে চা চাইব। ভক্তির বিয়েতে এসে বাইরে থেকে কিনে খাব নাকি—তাই এখানে চলে এলাম—ও মা প্রীতিকণা বলছে, ডাক না ও বাড়ির শক্তির মাকে। সে তোদের চা, জলখাবারের সব ব্যবস্থা করে দেবে।

কথায় কথায় সবাই ডাকছে শক্তির মাকে।

প্রীতিকণা কুন্তিকে দেখিয়ে বলছে, ও তো আমার ঘরের লোক। ও কিছু মনে করে না।

রান্নার উগ্র গন্ধে ও বাড়িতে যেতেই পারে না কুন্তি। গা গুলিয়ে আসে। বিয়ে বাড়িয় কিছুটা ঝামেলা মিটিয়ে ঘরে ফেরে। হাড়িতে ভাত, তরকারি যা থাকে তা খেয়ে হাত পা ছড়িয়ে কিছুটা সময় বিশ্রাম করে নেয়।

বিয়ের সব ঝামেলা যখন মিটল তখন রাত একটা বেজেছে। বাসরশয্যায় প্রীনিকণা আজ রাত জেগে নাতজামাইকে নিয়ে আনন্দ

করবে। বর বরণের পরে সুধাও বাড়িতে চলে গেছে, মাকে মেয়ের বিয়ে দেখতে নেই বলে। এ বাড়ির সব দায় দায়িত্ব কুন্তি নিজের কাঁধেই নিয়েছিল, কেউ তাকে এরজন্য কিছু বলেও নি। বরযাত্রী-দের খাওয়ান, কে খেল কি খেল না—সব দিকে নজর ছিল কুন্তির। সকালে দধিমঙ্গল অনুষ্ঠান থেকে গঙ্গাপূজা করান সব ব্যাপারে কুন্তি। ওদিকে অধিবাসের তত্ত্ব এল। মেয়ে ছেলের বাড়ির শাড়ি চন্দন পরে বৃদ্ধিতে বসল—কোথায় ছিল না কুন্তি, মাঝে মধ্যে চা আর পান খেয়েছে শুধু। খেলেই শরীরে অবসন্নতা আসছে। কুন্তি এ বাড়ির লোক ভেবেই কেউ ওকে খেতে ডাকে নি। সত্যিই ওর খিদের অনুভূতি নেই।

ওদিকে ক্যাটারারের লোকেরা কাজ শেষে বিড়ি ফুঁকছে। মাছ মাংস প্রচুর রয়ে গেছে। বড় বড় ডেকচি, বালতী ভরে সেগুলো পাখার নিচে রাখা হয়েছে, কাল এগুলোর সদগতি হবে।

তবু নষ্ট হবে খাবার। লোকে কত খাবে। বিয়ে বাড়ির লোক যারা রয়ে গেছে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ জন হবে। এত খাবার বাঁচল শুধু একজন লোক অভুক্ত রইল। তাকে কেউ খাবারের জন্য ডাকে নি। কাল কুন্তি আবার আসবে, কাল কাজের জন্য তার আর প্রয়োজন নেই। তবে কাল সুধা তাকে না খাইয়ে ছাড়বে না। বলবে, কাল তুমি কী খেয়েছ তা দেখি নি, আজ আমি তোমাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব।

প্রীতিকণা তার মেয়ে জামাইদের খাওয়া পরা নিয়ে এত ব্যস্ত, সেও হয়ত বলবে, তোর মেয়েদের জন্য মিষ্টি নিয়ে যাস কিন্তু। এত মিষ্টি কে খাবে। বলবে, বেশি করে মাছ খা। বৌকে বেশি করে মাছ দে। এত খাবার কে খাবে।

কুন্তি 'যোগাযোগ' বাড়ি থেকে যখন বেরুল তখন অনেক রাত। সারা গলিতে আলোর বন্যা যেন দিনের আলোকে লজ্জা দিচ্ছে। কুন্তি ৩৬ নম্বর বাড়ির দিকে যত এগুতে লাগল

ততই খিদেটা বেশি করে পাচ্ছে। খুব খিদেই পেয়েছে।

বিয়ে বাড়িতে হাজারের ওপর লোক খেল, কত খাবার নষ্ট হ'ল। অপর্যাপ্ত খাবার রয়ে গেল। একজন লোক শুধু অভুক্ত মুখে বিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে। ওকে খেতে ডাকে নি। ভক্তির পিসিরা নিজেদের খাবার সময় তাকে ডেকে নিতে পারত। প্রীতিকণা তার মেয়েদের বলতে পারত, এই বৌটাকে তোরা ভাল করে খাইয়ে দিস।

এখন মনে হল, ওরা তাকে খাবার খেতে ডাকবে কেন? তার বাড়ির কাউকেই তো নেমন্তন্ন করে নি।

এ কথাটা মনে করতে গিয়ে কুন্তি নিজের মনের কাছে কঠিন হয়ে উঠল। মেয়েদের উদ্দেশে সে মনে মনে বলল, তোরা ভাবছিস তোদের মায়ের মান সম্মান জ্ঞান নেই। তাই জন্মদিনের সবার খাওয়ার শেষে দেওয়া খাবারটা হাত বাড়িয়ে আমি নিই। এ সব তো ঘরোয়া ব্যাপার। এক জায়গায় পাশাপাশি থেকে এ সব মানতেই হয়, কিন্তু আজ আমি কেমন না খেয়ে এসেছি দ্যাখ! তোদের বাবার মান সম্মানের দিকে তাকিয়ে আমি বিয়ে বাড়ির কোন খাবারই খাই নি। তবু ওদের সব কাজ সুষ্ঠ ভাবে করে দিয়ে এসেছি। বিয়ে বাড়ির জলস্পর্শ না করাই তো ও বাড়িকে অপমান করা, ওদের আত্মীয় পরিজন সবাই কাল শুনবে, শক্তির মা এ বাড়ির জলস্পর্শ করে নি, তার বাড়ির কেউ নিমন্ত্রিত ছিল না বলে। উপযুক্ত জবাব ওদের দিয়ে অসতে পেরেছি কিনা তা তোরাই বল।

কুন্তি পরম নিশ্চিন্তে ৩৬ নম্বর বাড়ির কড়া ধরে নাড়া দিল।

সাবান কণা সেনগুপ্ত

এ এক অদ্ভুত প্রেম। এ রকম প্রেমের কথা কেউ কখনো শুনেছে কিনা জানা নেই। অন্তত যূঁইদি তো জানেই না।

অজয় থাকে আমেরিকাতে, কয়েক বৎসর হল। দেশে আই. আই. টি. ইঞ্জিনীয়ারিং থেকে পাশ করে চলে যায় বাইরে। ঐ দেশে আরো চারটে সাবজেক্টে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি নেওয়া হয়ে গেছে। এবার মেডিক্যালটাও পড়বে ভাবছে। ভেবেছে যখন ওটাও ঠিকই করে নেবে। ইন্টারনেটে বছরখানেক আগে যূঁইদির মেয়ে ধৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। অলাপ হতে হতে—ভাল লাগা —তারপর প্রেম নিবেদন।

প্রেম বেশ গাঢ় পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখে নি। ধৃতি দেশে এসেছে ক'মাস হল। যূঁইদি খুব চিন্তিত মেয়েকে নিয়ে। ইন্টারনেটে ওদের প্রেম-ভালবাসার কথা শুনে বলেন,—সে কি রে? চোখে দেখলি না, সামনা-সামনি হলি না, মেলামেশা করলি না, না দেখে ভালবাসা কি করে হয় জানি না, বাপু। খুব চিন্তায় পড়ে যায় যূঁই।

ধৃতি শুনে বলে,—কেন? ছবি পাঠিয়েছি তো। ও-ও পাঠিয়েছে ছবি।

ওরে বাবা, ছবির মাধ্যমে বিয়ের ব্যাপারে ছেলে-মেয়ে পছন্দ-অপছন্দ করা যায় জানি। এতদিন ধরে চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ মেলামেশা না করে শুধু ইন্টারনেটে প্রেমভালবাসা, তারপর বিয়ে হয়। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

ধৃতি রেগে ওঠে,—থাক তোমার আর মাথায় কিছু আসার দরকার নেই। আমার ব্যাপার আমিই বুঝব।

ধৃতি তো ফ্রান্সের গ্রেনেবল ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা করতে গেছে। দু বছর হল ওখানেই আছে। ইন্টারনেটে ওদের চুটিয়ে প্রেম চলছে। ধৃতি দেশে আসার আগে অজয় নাকি ওকে জিজ্ঞেস করেছে,—আচ্ছা, দেশে গরমের দিনে তুমি ক'বার স্নান কর বলতো ?

ধৃতি—তা বার চারেক তো করিই।

—কতক্ষণ ধরে স্নান কর ?

—ঘণ্টাখানেক তো বটেই।

—তোমার মাসে ক'টা সাবান লাগে ? কি সাবান ব্যবহার কর ?

তিন-চার মাস যায় বিদেশে থাকলে। দেশে গরমের সময় এলে দু-এক মাস একটা সাবানেই চলে। জনসন কিডস ব্যবহার করি। ধৃতি এবার রেগে বলে,—তোমার কি হয়েছে বল তো ! তোমার এসব মাথামুণ্ডু প্রশ্নের মানে বুঝতে পারছি না আমি।

—আহা রাগ করো না, রাগ ক'রো না। একটা সাবান যখন তোমার এতদিন যায়, তার মানে তুমি মোটা নও। এটাই আমার জানার ছিল আর কি !

এবার ধৃতি হো হো করে হেসে বলে,—কেন, আমি যদি মোটা হই তবে তোমার আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি হবে ? ঠিক করে বল, এখনো সময় আছে।

—আরে না না, মোটাদের অনেক অসুবিধে। অনেক খানি জায়গা জুড়ে থাকে, সব কিছুই বেশি বেশি লাগে।

—থাক, আর বিল বাড়িয়ে দরকার নেই। এবার ছাড়তো ফোনটা। গত মাসে এক লাখ টাকার উপর বিল দিয়েছিলে, মনে আছে ?

—আচ্ছা বাবা, ছাড়ছি···বাই !

যূঁইদি শুনে যায় মেয়ের কথা। হাসিও পায় ছেলেমানুষি দেখে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনায় জর্জরিত হয়ে থাকে। কি জানি কেমন হবে, মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে কথা। ছেলেটাকে না দেখলে কিছুইতো বুঝতে পারছে না। কবে আসবে তাও তো বলছে না। সবটাই ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়েছে যূঁইদি।

ভাল হলেই ভাল

প্রাপ্তিস্বীকার। পুস্তক

আকাশ বাতাস সূর্য এবং আমি □ শ্রীবাচস্পতি। সমতট প্রকাশনী, ১২ই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সরণী (তেতলা) কলকাতা-২৬, কাব্যগ্রন্থ। মূল্য ত্রিশ টাকা।

স্মৃতিময় □ পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, প্রয়াস ৫ সত্য ডাক্তার রোড, কলিকাতা-২৩ সতীর্থ বন্ধু কবি মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ। দামের উল্লেখ নেই।

দ্বিপ্রহরে চন্দ্রোদয় □ দেবশ্রী দাস। চোখ প্রকাশনী ৬ আসগর মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৪৬, ৩৫ টাকা। কাব্য সঙ্কলন।

কওয়া কথা □ রামদাস বাবাজীর বাণী। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ জন্মস্থান, একচক্রাধাম, বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পাঁচ টাকা।

নিরুদ্দেশে আছ প্রিয়া, পরমা আমার □ প্রিয়ব্রত গৌতম। দিনান্তের অন্বেষণ, ডাক্তার লেন, চুঁচুড়া, হুগলী। মূল্য ২৫ টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী মুনিকেশ শীল।

গাজন সন্ন্যাসীর দল ও দুর্গা

দীপালী সরকার

চৈত্র মাস। ফাল্গুনের হাওয়া দিচ্ছে। বিকেলের দিকে পড়ন্ত রোদের সঙ্গে মেঘের লুকোচুরি খেলা। তারপরই কাল-বৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া। বাতাসে সেই মিষ্টি আমের বোলের মন-মাতানো গন্ধ। পাগল করা দখিনে বাতাস। সব মিলিয়ে কেমন যেন চারিদিকে এক উদাস উদাস ভাব। পশ্চিমে সূর্যদেব রংএর বালতি উপুড় করেছেন; ব্যস আর কথা নেই। সবার চোখে রংয়ের নেশা। সবার মনই হাওয়ায় ভাসা।

ঠিক এই রকম যখন অবস্থা তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এক গাজন সন্ন্যাসীর দল। "বাবা তারকেশ্বরের সেবা লাগি মহা দে-এ-এ-এব।"

এক দল মেয়ে পুরুষ রুক্ষ চুলে, শীর্ণ শুষ্ক মুখে মাটির সরা হাতে ভিক্ষে করছে।

এ কদিন তারা ভিক্ষে করেই খাবে। তারপর বছরের শেষে সংক্রান্তির দিন মহাদেবের পুজো দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করবে। এতে নাকি মানত করলে, যে মানত করে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিপদ-আপদ কেটে যায়।

এই রকম একদল গাজন সন্ন্যাসীর দল যাচ্ছে যতীন দাস রোড ধরে। বাঁয়ে, ডাইনে বাড়িগুলির ওপর নিচে বারান্দার দিকে দেখতে দেখতে তারা চলেছে। তাদের কেউ কেউ গান করে। কেউ বা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সস্তার চকমকে পোষাক পরিয়ে শিব-দুর্গা সাজিয়ে নাচায়। সকলেই এদের পয়সা দেয়। গরীব, গেরস্থ সবাই। শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন সম্প্রদায় বারান্দায় বেরিয়ে এদের নাচ দেখেন না, গানও শোনেন না তবে পয়সা দেন ছুঁড়ে।

বাবা তারকেশ্বর বড় জাগ্রত। দু-চার পয়সা ছুঁড়ে দিলে বাবা ভাল বৈ মন্দ করবেন না। কর্তা যতই বলুক, দিয়ো না, দিলে আবার আসবে—গিন্নীর মন মানে না।

কর্তা বল্লে কি হবে। যা চারদিকে হার্টের অসুখ, আর রাস্তা ঘাটে গাড়ি ঘোড়ার কি ভিড়। ঠাকুর দেবতার মানত করেছে এরা, দু দশ পয়সা না দিলে চলে? আর পয়সাটা দেওয়াও হয় বেশ কায়দা করে যাতে গাজনের দল বুঝতে না পারে পয়সাটা কোত্থেকে পড়ল।

পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়েই সরকার-গিন্নী ডাকছেন 'দুর্গা ও দুর্গা' কোথায় গেলি? ওমা এই তো এখানে ছিল, গাজনের শিবদুর্গার নাচ দেখবার জন্য ছটফট করছিল, কেবল গিন্নীর জন্যই বারান্দায় যেতে পারছিল না। বারান্দায় যাওয়াতে দুর্গার অবশ্য কোন বাধা নেই। যখন তখন ফাঁক পেলেই সে বারান্দায় যায়। ইস্ত্রি-ওয়ালাকে দেখে হাসে, দুধ ওয়ালাকে দেখে হাত নাড়ে। অবশ্য সবই গিন্নীর চোখ এড়িয়ে।

সরকার-গিন্নীর চা চাই। চারটে বাজে। আজ আবার রবি বার। কর্তা ছেলে সবাই বাড়ি আছেন। সকলেরই চা হবে। গিন্নীর চোখ পড়ল নিচে। সদর দরজা একটু ফাঁক করা, তার গায়ে দুর্গার ফর্সা হাতখানি দেখা যাচ্ছে। দুর্গা দেখতে সুন্দর। কাজে দেবার সময় দুর্গার মা এসে বলে গেছল "মা, মেয়ে আমার সোমত্ত সুন্দর, তোমার কাছে রেখে গেলুম, দেখো ফাঁকে বেরুতে দিয়োনি।"

সরকার-গিন্নী সে কথা রেখেছেন। তিনি খুবই বুঝদার। দুর্গাকে তিনি খুবই আগলে রাখেন। কিন্তু এমন সদর দরজার গায়ে দুর্গার ফর্সা হাতখানি দেখে গিন্নীর বুঝতে দেরী হল না যে দুর্গা নিচে। ব্যাপার কি? দুর্গার এতখানি সাহস হল কি করে? গিন্নী দোতলায় বারান্দার কিনারে দাঁড়িয়েব্যাপারটা লক্ষ করছেন।

শোনা গেল, দুর্গা বলছে, "ও সিধু কাকা, সিধু কাকা গো, আমি তোমায় ওপর থেকে দেখেই চিনেছি। কেমন আছ? কাকী কেমন আছে? আর আমার মা, বাবা ঠাকুমা? কচি ভাই বোনেরা? বাবা পুকুরে পোনা ফেলেছে? এবারে ধান কি রকম উঠল গো? বাবা মুদী জেঠার দোকানে ধার শোধ দিয়েছে? এবারে জনার্দন ঠাকুরের মেলায় যাব, বাবাকে বোলো।"

গিন্নী কোনদিন দুর্গাকে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলতে শোনেন নি। তিনি অবাক হয়ে শুনছেন আর ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছেন।

ইতিমধ্যে সরকার বাড়ির সামনে রাস্তায় সব গাজনের দল দাঁড়িয়ে গেছে। তাদেরই মধ্যে একজন রোগা কালো উপবাসী চেহারার সিধুকাকা। তার কোটর গত জ্বল জ্বলে চোখে দুর্গার দিকে মুগ্ধ হয়ে খানিক দেখে স্নেহমাখা গলায় দলের লোকদের উদ্দেশে বলে উঠল, "ওমা দেখ, দেখি আমাদের দুগ্গি যেন মা দুর্গো হয়েছেন। তা হ্যাঁ মা, তুই এখানে আছিস?"

দুর্গা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল। পাড়ার সিধুকাকা দেশের ঘরের খবর দিল। দুর্গা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার মত সব খবরগুলি গিলতে লাগল। দুর্গা কাঠের ভারী দরজাটা আর একটু ফাঁক করে সিধুকাকা নারান দাদাদের সঙ্গে খলবল করে হাত নেড়ে মাথা নেড়ে কথা বলতে লাগল। দুর্গার সামনে লোহার গ্রীলের বন্ধ গেট। তার ওপারে গাঁয়ের গাজনের দল।

মিনিট কয়েক পরে গাজনের দল ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো।

সিধুকাকা ভেজা ভেজা গলায় বল্লে, "আসি রে দুগ্গি, হরিদাকে গিয়ে সব বলব যে তোর সঙ্গে দেখা হল। বড় মেলায় আসবি তো?"

দুর্গা হ্যাঁ না কিছুই বলল না, কেবল লোহার গেটটা ধরে সজল চোখে তার গাঁয়ের একান্ত আপন জনের দিকে চেয়ে রইল।

সরকার-গিন্নীর মন বড় ব্যাকুল হল। আহা! বনের হরিণকে তিনি যে খাঁচায় পুরেছেন! রূপ গুণ সবই আছে কেবল অবস্থা নেই।

লিটল ম্যাগাজিন ও স্বউদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের প্রচার ও বিক্রয়ের একমাত্র দায়বদ্ধ অব্যবসায়িক উদ্যোগ—

রা ম ধ নু

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২, এস. পি. সি. ব্লক, কাজিপাড়া

বাঘাযতীন, কলকাতা-৭০০০৯২

তিন কপি করে পত্রিকা ও বই পাঠানো যেতে পারে। বিক্রি হয়ে গেলে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ছেলেটি মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অফিস থেকে বার হবার মুখে টিপ টিপ, বাসে ওঠার পর টপ টপ—নামবার সময় ঝমাঝম। প্রচণ্ড বৃষ্টি। কোনরকমে ছুট দিয়ে একটা গাড়ী বারান্দার নীচে দাঁড়ালুম। বারান্দাটা জরাজীর্ণ। মাথায় ফোঁটা ফোঁটা জল। ক্রমশঃ ফোঁটা বড় হতে লাগল। রাস্তা ডুবু ডুব। জল ফুটপাথ মুখো। এবার জুতো ভিজবে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাঁটা দেব—শরীর তেমন নয়। এখানে দাঁড়িয়ে বারান্দার উৎপাত সহ্য করবার মতনও ধৈর্য্য নেই। আকাশ আরও কালো হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে চড় মারতে সুরু করেছে। কি করি? এক পা এগুই—দু পা পিছুই।

আপনার ছাতা দরকার আছে? একটা ছেলে—মাঝ বয়সী, আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'কাকে বলছ?'

'আপনাকে। বাড়ী যাবেন। জলে আটকে পড়েছেন তো?' হাতে দুটো ছাতা।

'এই নিন।' একটা এগিয়ে দিল।

স্বভাবতই গোলমালে পড়লুম। মতলব কি। হঠাৎ আমাকে ছাতা দিচ্ছে কেন?

'আমাকে তুমি চেনো? ব্যাপারটা কি? গায়ে পড়ে উপকার করছ। ধান্দাটা কি?

ধান্দা হল, আপনাকে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিয়ে ছাতাটা নিয়ে নেব। এবং এই যে উপকার করব, সেজন্য কিছু অর্থ সাহায্য চাইব।'

বেশ পরিপাটী কথা।

জিজ্ঞাসা করলুম: সাহায্যের পরিমাণ?

'আপনার বিবেচনা যা বলবে। একটু থেমে: 'আকাশ কি রকম পাগলামো সুরু করেছে। আমার অফারটা এ্যাকসেপ্ট করুন। নিজে বাঁচুন। আমাকেও বাঁচান।'

তবু সংশয়, কোন্ প্যাঁচে পড়ে যাব!

'তোমার নাম কি? থাক কোথায়?'

বলল। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বসে আছে সে কথাও বলল। এবং আরও বলল: 'যেতে যেতে বাকীটা শুনবেন। চলুন।' একটা ছাতা দিল।

নিলুম। রাস্তায় নামলুম।

ঝড় ও বৃষ্টির দাপটটা রাস্তায় নেমে আরও বেশী করে মালুম হল। ছাতা পিছন দিকে উড়ে যেতে চাইছে। বৃষ্টির জল মুখে পড়ে ফট ফট আওয়াজ করছে। হাঁটাটা কতকটা ছোটার মতন। কানে এল:

'মেসোমশায়, বাবা মা, ভাই বোন নিয়ে একটা নড়বড়ে সংসার আমাদের। বাবার আয়েতেই কোনরকমে চলে। তাই যতদিন না একটা চাকরী হচ্ছে, ততদিন এটা সেটা করে সংসারকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। একটা ফ্ল্যাট বাড়ীর পাঁচতলায় সকালে চার বালতি টিউবওয়েলের জল দিই একটা ফ্যামিলিকে। ওদের গাড়ীও ধুয়ে দিই। বাজারে বড় সাহেবদের শপিং বা মার্কেটিং-এর ভারী ব্যাগ বয়ে এনে গাড়ীতে তুলে দিই। কেরোসিন তেলের লাইন বেচি, পার্টির মিটিং-এ গাঁ থেকে লোক এনে দিই, কমিশনে বারোয়ারী পুজোর চাঁদা তুলি। তারপর ঝড়ে জলে রাস্তায় গাড়ী আটকে গেলে পেছন থেকে ঠেলা, ছাতা ভাড়া খাটানো। এইসব নানা ফন্দি-টন্দি করে রোজগার—বুঝলেন। আপনি তখন জানতে চাইলেন, ধান্দাটা কি। আশা করি, ইউ আর নট স্যাটিসফায়েড। তবে মেসোমশায়—।

'বল। শুনছি—।'

'যেদিন এদিককার বাজার 'ভাল' থাকে, সেদিন রাতের দিকে চলে যাই চৌরঙ্গী পার্কস্ট্রীট। বার থেকে হেভী ড্রিংক করে মেয়ে পুরুষ রাস্তায় বেরোয়, পা টলে, চোখে ঝাপসা দেখে। আমি তাদের হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দিই। আবার যাদের গাড়ী নেই তাদের রাস্তা পার করে দেওয়া—

একটু নীরবতা—তারপর—'মোট কথা, সংসারকে দেখতে হবে।' ছেলেটি থামল।

বাড়ী পেঁাছে ওকে ছাতা ফেরত দিলুম। তারপর নগদ পাওনাটা।

বললুম : 'খুশী তো—যা দিলুম?'

'ঠিক আছে।' বলেই বেরুতে গেল—

'একটু বসে যাও।' দুর্যোগটা থামুক।'

'বসার উপায় নেই।' যেতে যেতে ছেলেটি বলল, 'দুর্যোগই তো আমার ভরসা।'

অনুরাগ

বইপাড়ায় প্রাপ্তিস্থান :

লিট্‌ল ম্যাগাজিন স্টল

রামানাথ মজুমদার স্ট্রীট, স্টল নং ৫৬

কলিকাতা-৯

ঠিক ঠিকানা। সুশীলচন্দ্র দাস

সাউথ পয়েন্টের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট অমিতাভ রায়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্লাস সিক্সের ছাত্র হলেও সমস্ত নিচু ও উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে ওর দারুণ সখ্যতা। তার কারণ ও সবেতেই তুখোড়। কবিতা আবৃত্তি, গান, খেলাধুলার সুবাদে স্কুলে ও যথেষ্ট জনপ্রিয়। ওকে না চেনে স্কুলে এমন কেউ নেই। প্রতি দিন ছুটির পর ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে আসে আর তার সঙ্গে বকবক করতে করতে বাড়ী ফেরে।

বালিগঞ্জ এলাকায় অভিজাত পরিবেশে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'রায়ভিলা' মাথা উঁচু করে নিজের আভিজাত্য জানান দেয়। পুত্র অমিতাভ রায় মানবেন্দ্রনাথের বড় আদরের সন্তান। মা দীপ্তিময়ী যথেষ্ট দীপ্তি নিয়ে ছেলেকে দেখ-ভাল করেন। একমাত্র সন্তান অমিতাভ যেন সকলের নয়নের মনি। প্রায় ছয়-সাত জন ঝি চাকর বাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। অমিতাভের কাছে তারা কেউ মাসি, কেউ দিদি, কেউ দাদু, কেউ জ্যেঠু ইত্যাদি। এমন প্রাণবন্ত আর হাসিখুশি অমিতাভকে নিয়ে তাই রায় ভিলার গর্বের সীমা নেই।

এহেন অমিতাভ হঠাৎ কোথায় যেতে পারে তা নিয়ে স্কুল থেকে সুরু করে বাড়ি, পাড়া তোলপাড়, ড্রাইভার লক্ষণ শুকনো মুখে জানান দেয়, খোকনকে কত খুঁজলাম, গাড়ী নিয়ে ও যেখানে যায়, সেসব জায়গা সব দেখেছি, কিন্তু কেউ খোকনের হদিস দিতে পারল না। লোকাল থানা থেকে লালবাজার সর্বত্রই ইনফর্ম করা হয়েছে। বাড়ীটা হঠাৎ যেন শোকে পাথর হয়ে গেছে।

মা দীপ্তিময়ী অনুযোগ করেন, ঐ জন্য বলেছিলাম স্কুলবাসে

অমি যাতায়াত করুক। তাহলে স্কুল কর্তৃপক্ষের কন্ট্রোলে থাকত।

বাবা মানবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ফুঁসে ওঠেন, কি বললে আমার ছেলে স্কুল বাসে যাতায়াত করবে? কেন তোমার এই দেউলিয়াপনা মনোভাব? ভগবান আমাদের বৈভব দিয়েছেন, আভিজাত্য দিয়েছেন। তা হলে কেন শুধু শুধু তোমার ঐ ভিখারীপনা মনোভাব?

কাঁদতে কাঁদতে দীপ্তিময়ী বলেন, বেশ, তোমার আভিজাত্য নিয়ে তুমি থাক। কিন্তু আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমি আর কিছু চাই না।

সত্যিই তুমি মেয়েছেলে। এত লোক অমিতাভর জন্য খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাগল হয়ে যাবার যোগাড়, কই তাদের কথা তো একবারও বলছ না। শুধু নিজের স্বার্থ ছাড়া তোমরা আর কিছুই বোঝ না। কথাগুলি বলে অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে মানবেন্দ্রনাথ নিজের অসহায়তার কথা জানান দেন কিন্তু গাম্ভীর্য বজায় রেখে।

শূন্য দৃষ্টিতে যেন বোবা হয়ে যান দীপ্তিময়ী। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন, সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা যদি বুঝতে তাহলে একথা বলতে পারতে না।

ভাল বলেছ, বিজ্ঞান যা শুরু করেছে এবার হয়তো তোমাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য পুরুষদের সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। দেখি বিজ্ঞানীদের কাছে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায় কি না।

কি ব্যাপার? কারো কোন সাড়া নেই। বাইরে থেকে কলিং বেল টিপছি—তাতেও কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার মেন কোলপোসিবল গেট বন্ধ। ব্যাপার কি? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে—? কথাগুলো বলে অমিতাভ তাকায় সকলের দিকে। পলকে দীপ্তিময়ী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কিছুই বলতে

পারেন না। শুধু অশ্রুর বন্যায় তাঁর সব আশঙ্কা দূর হয়ে যায়।

অভিভূত অমিতাভ বলে, তোমরা আমাকে খুব খোঁজা খুঁজি শুরু করেছো তো? আসলে আমি দেখছিলাম বৃষ্টিবিঘ্নিত কলকাতায় পায়ে হাঁটলে কেমন লাগে। তা মন্দ লাগল না। এক জন বৃদ্ধ দম্পতিকে রিক্সায় তুলে দিলাম। বাস থেকে এক বৃদ্ধ নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন, তাঁকে ধরে আস্তে আস্তে শেডের তলায় নিয়ে গেলাম। আবার আমার মত একটি ছেলে ম্যানহোলে পড়ে যাচ্ছিল। দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম। তারপর পুলিশ এসে আমাকে ধন্যবাদ দিল। আমি বলেই দিলাম ওর মনের অবস্থা খুব খারাপ। এক্ষুনি ওর মা বাবাকে খবর দিন। আর দেখ, আমি কেমন ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছি। শীগগীর হরলিকস তৈরী কর। আমি জামা কাপড় ছেড়ে আসছি।

বাড়ীর সবাই হতভম্ব। ব্যাপারটা কি হোল কেউ বলতে পারছে না। মা, বাবা আদর করে বলে, দেখ অমিতাভ কি পাগলামি শুরু করলি। কাউকে কিছু না জানিয়ে—

বাবার কথা কেড়ে নিয়ে অমিতাভ বলে, ঐটাই তো মজা। মানে বেশ থ্রিল অনুভব করছি। তোমরা কিছু ভেব না। আমি ঠিক আছি।

এর সাতদিন পর স্কুল থেকে বেরিয়ে অমিতাভ দেখলো ড্রাইভার লক্ষ্মণ বেশ কিছুটা দূরে একটা ষণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে কি বলাবলি করছে আর সন্দেহজনকভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অমিতাভ বাঘের ক্ষিপ্রতায় নিঃশব্দে একটা লাইটপোষ্টের আড়ালে চলে আসে। ওদের কথোপকথন শুনে তাজ্জব বনে যায়।

গত কয়েকদিন ধরে কোলকাতায় গাড়ীচুরির উপদ্রব বেড়েছে। পি, জি হাসপাতাল থেকে সুপারের গাড়ী, রাইটার্স বিল্ডিংস

থেকে মন্ত্রীর গাড়ীর এয়ার হর্ন, হাইকোর্ট থেকে প্রধান বিচারপতির গাড়ীর মূল্যবান পার্টস হামেশাই চুরি যাচ্ছিল। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে আর দুষ্কৃতরা তাদের কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে কাগজে সমালোচনার ঝড়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

অমিতাভ কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করেছে, লক্ষণ আর ষণ্ডামার্কা লোকটার কথাঃ কি লক্ষণ ভাই। এত ভয় পাচ্ছ কেন? না ওসমান ভাই। তুমি গাড়ী নিয়ে যেতে চাও চলে যাও। কিন্তু খোকাবাবুকে নিয়ে ভেগে পড়ার আশা ছেড়ে দাও।

আরে অত ভয় পাচ্ছ কেন? পাঁচ লক্ষ টাকা ক্যাশ পেয়ে যাবে। তোমার সারা জীবনের সম্বল। লক্ষণ কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওসমান আর বলতে দেয় না।

তাহলে লক্ষণ ভাই আগামী বৃহস্পতিবার। মনে থাকে যেন।

অমিতাভ গা ঢাকা দিয়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে আসে।

আগামী বৃহস্পতিবার। তার মানে মাঝখানে আর একটা দিন। হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ে। দীপ্তিময়ী জিজ্ঞাসা করেন, কি রে ট্যাক্সিতে ফিরলি যে?

তুমি কি করে জানলে?

আমি উপর থেকে দেখলাম।

ও বাবা, তুমি আবার আমার উপর গোয়েন্দাগিরি সুরু করলে নাকি?

কি খোকাবাবু। তুমি কোথায় থাক বলদিকি। আমি তোমায় কত খুঁজলাম। শেষে না পেয়ে চলে এলাম—লক্ষণের কথায় আফশোষ ঝরে পড়ে।

সত্যি লক্ষণদা। কিছু মনে কোর না। আমার ভুল হয়ে গেছে। সত্যি লক্ষণদা, আমার জন্য তোমার খুবই কষ্ট হোল তাই না।

না খোকাবাবু। মানে—কিছু বলতে যাচ্ছিলো, জান লক্ষণদা আমি না একটা লটারীর টিকিট কেটেছি। যদি ফার্স্ট প্রাইজ ওঠে তাহলে একেবারে থোক পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ। ভাবছি টিকিটটা তোমায় দিয়ে দেব।

ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত চমকে ওঠে লক্ষণ।

না বাবু, আমি গরীব মানুষ।

সেই জন্য তো তোমার টাকার দরকার। এই কথা বলে অমিতাভ ভাল করে নিরীক্ষণ করতে থাকে লক্ষণকে।

না বাবু সে কি করে সম্ভব?

হতেও তো পারে—এই বলে অমিতাভ ভিতরের ঘরে চলে যায়।

লালবাজার স্পেশাল ব্রাঞ্চ। অমিতাভ স্কুলে না গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে ডি, সি, ডি, ভি ওয়ান নারায়ণা ঘোষকে নিজেদের গ্যড়ীর নাম্বারও দিয়ে দেয়।

খবরের কাগজে হেডলাইনঃ

স্কুলছাত্র অমিতাভ রায়ের অসামান্য কীর্তি। রীতিমত গোয়েন্দাগিরি করে গাড়ীচোর কিড্‌ন্যাপারদের ধরিয়ে দিয়েছে তীক্ষ্ম বুদ্ধিবলে। অপরাধীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও যেভাবে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রেখে বিরাট চক্রকে ধরিয়ে দিয়েছে তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। পুলিশমন্ত্রীর ঘোষণ, অমিতাভ রায়কে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাড়িতে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের ভিড়। একজন সাংবাদিক বললেন, —অমিতাভ, তুমি আমাদের গর্ব। তোমার জন্য সারা ভারত গর্বিত। তুমি তো শুনেছ পুলিশমন্ত্রীর ঘোষণা। ঐ একলক্ষ টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

অমিতাভর চট জলদি উত্তর—থ্যালাসেমিয়া রুগীদের চিকিৎসার জন্য ঐ টাকা আমি দান করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার ক্যামেরা ক্লিক করে উঠলো। জনসমুদ্রের প্লাবনে ছোট্ট অমিতাভ ভেসে যাবে এবার। এমন সন্তানের জন্য মা বাবারও গর্বে বুক ভরে গেল।

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত

সহজ সরল গদ্যে সম্পূর্ণ চৈতন্য-চরিতামৃত ১০০'০০, চৈতন্যভাগবত ৬০'০০ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১৫'০০ প্রকাশের পথে ঃ শ্রীশ্রীচণ্ডী, উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলী।

নবপত্র প্রকাশন

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

□

সহজ সরল গদ্যে সম্পূর্ণ গীতগোবিন্দ ২০'০০ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী ২০'০০ কুইজ অন শ্রীচৈতন্য ১০'০০ কুইজ অন নজরুল ১২'০০ শ্রীশ্রীলোক-নাথ ব্রহ্মচারী ২০'০০ প্রকাশের পথে ঃ শ্রীমদ্‌ভাগবত-সার।

শশধর প্রকাশনী

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

□

শ্রীচৈতন্য ও সাম্যবাদ ২০'০০ শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য ২৫'০০ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ২৫'০০ শ্রীচৈতন্য ও বাংলার নবজাগরণ ২৫'০০

নবভারতী ভবন

৩১-এ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

১ মাঘ ১৪০৭ লেখকের ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে অনুরাগীবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত।

স্বাধীনতার মূল্য দেবশ্রী দাস

আমি একটা ছোট্ট কারখানায় চাকরী করি। এখানে বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিকের সামগ্রী উৎপন্ন হয়। কোলকাতার নিকটেই বলে এই কারখানাটি পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে বেশ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আমরা পরিবেশ বলতে বুঝি দূষণ, খুন, ধর্ষণ, দিতে-হবে দিতে-হবে, অবরোধ এবং শহীদ স্তম্ভে মালা দিয়ে শোক জ্ঞাপন করা। তা সুপ্রীম কোর্ট নাকি বলে দিয়েছেন এসব চলবে না, মানে বিশেষ করে যে কারখানা থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া বের হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করে সেসব কারখানা রাখা চলবে না। তা ঐ আইন মানতে বয়ে গেছে আমাদের! সুপ্রীম কোর্ট তো বলেই খালাস। কোথায় যাবে কর্মরত খেটে খাওয়া মানুষ-গুলো। তেমন সদিচ্ছা আমাদের আছে নাকি বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার? তার কারণও আছে। আমাদের দেশে নাকি গরীব ও বেকারের সংখ্যা খুব কমে গেছে। তার মানে আমরা সবাই স্বয়ংসম্পূর্ণ,—আমাদের আর কোন অভাব নেই, দুঃখ নেই। শুধু ভোটের সময় ঐ একটু গ্লিসারিন দিয়ে চোখের কোণে জল এনে বলতে হয়, গদি পেলে আমরা আপনাদের জন্যে জান লড়িয়ে দেবো! সব দুঃখ দূর করে দেবো। মোটকথা আপনাদের দ্বিতীয় আমেরিকা বানিয়ে দেবো—শুধু ভোটটা আমাকে দিন।

তারপর—তারপর ভোট শেষ, যুদ্ধ শেষ, আশারও শেষ, পাওয়ারও শেষ, ভালোবাসারও শেষ। ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত জন-গণ ফিরে যাও নিজ কাজে কারণ নেতাদের ভাষণ শেষ।

ডিউটির পর বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অতীব মলিন

বেশে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ আমার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন। মনে হোল খুব চেনা। কিছুটা পথ অনুসরণ করার পর স্থির নিশ্চিত হলাম, উনিই আমার বাংলার মাষ্টারমশাই —শ্রী রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—দাপুটে স্বাধীনতা সংগ্রামীও বটেন। এগিয়ে গিয়ে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। উনি থমকে গেলেন—আমার মুখে কি যেন খুঁজছেন। আমি প্রণাম করলাম। উনি দুহাত আমার মাথায় রাখলেন—কাঁদলেন—ভালবাসলেন। আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

চোখের জল মুছে আমায় বললেন, তুই এখনো ব্যাকডেটেড্ আছিস। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের এখন আর প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাবার রেওয়াজ নেই। তোর বন্ধুবান্ধব দেখলে তোকে পাগল বলে টিটকারি দেবে।

মাষ্টারমশাই! আপনি তাহলে আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন?

পারবো না? তোকে তো আলাদা করে চিনতে হয় না। তোর লেখার মধ্য দিয়ে তোকে চিনতে পারা যায়। তোর সেই অবিস্মরণীয় রচনা "আমার জীবনের স্মরণীয় দিন" আজো আমার কানে বাজে,—অন্তরের অন্তস্থল মথিত করে। তোর লেখার মধ্যে একটা ভালবাসার নিবিড় বন্ধন আছে রে,—তা কি ভোলা যায়!

মাষ্টারমশাই! আজো সেই ঘটনা আপনার মনে আছে। সে তো অনেকদিন আগের একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

ওরে পাগল! আমি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী—নুন মারা আন্দোলনে আমার হাতে খড়ি—কনষ্টেবল পিটিয়ে আমার বর্ণ পরিচয় শুরু—জেলের নির্জন সেলে আমার স্বাধীনতার মন্ত্র-গুপ্তি। আমি কি কিছু ভুলতে পারি?

আমার চোখে জল এসে যায়। অতীতের সেই নির্মম ব্রিটিশ

নির্যাতন, শহীদের মৃত্যুর মিছিল, ভারতমাতার নির্মম অবমাননা আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার সঞ্চার করে। অশ্রুসজল চক্ষে বলি, কিন্তু মাষ্টারমশাই. একি চেহারা হয়েছে আপনার। আপনাকে তো চেনাই যাচ্ছিল না। এত দীন আর মলিন বেশে আপনাকে দেখবো—ভাবতেই পারি নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাষ্টারমশাই বলেন, তুই এত বোকা জানতাম না তো। এখন আমার বয়স ৯০ বৎসর। তার উপর আমি স্বাধীনতা সংগ্রামী, সর্বোপরি আমি একজন বলিষ্ঠ চিন্তা-ধারার মানুষ। আমার চেহারা খারাপ হবে না তো কার হবে, বল?

মৃত্যুর সাথে ভালোবাসা মোর
কিছুই চাই না আমি
জীবনের সাথে বৈরিতা মোর
জীবন যে অনেক দামি
কিছুই তো চাইনি কিন্তু পেয়েছি
অনেক অনেক আশা
ছলনার মরীচিকায় ঘুরে মরি দিবানিশি
অনেক দূরে ঐ রক্তিম ভালোবাসা।

আমার চোখে যেন পলক পড়ে না। এই দীন-হীন চেহারার মধ্যে এমন অমৃতকণ্ঠ আমায় যারপরনাই ব্যথিত করে। আমি কিছু বলার আগে মাষ্টারমশাই বলেন, আচ্ছা তোর খবর কি? তোকে দেখে মনে হয় না তুই আগের সেই আমার প্রিয় ছাত্র সেই আমার সুভদ্র, সুপ্রিয়, শান্তশিষ্ট এক অতীন্দ্রিয় জ্যোতি। তোর মুখে কেন বিপদের রেখা দেখতে পাই?

মাষ্টারমশাই, আমি একটা প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করি। কঠোর পরিশ্রম আর অনন্ত দূষণ এই আমার দুই ভাই। ওরাই আমার আপনজন। তাই আমার এমন চেহারা।

বড় ভাল বলেছিস। কিন্তু তবুও আমরা বেঁচে আছি। বাঁচতে হবে—মরতে মরতে বাঁচতে হবে। আবার বাঁচতে বাঁচতে মরতে হবে। এই আমাদের বিধিলিপি।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে মাষ্টারমশাইয়ের এই অমৃতবাণী শুনতে থাকি। কিন্তু আর পারছি না। ক্ষিদেয় পেটের বত্রিশ নাড়ী বাপান্তর করছে। মুখ ফুটে বলেই ফেললাম, মাষ্টারমশাই আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। চলুন ঐ দোকানটায় বসি। কিছু খেতে খেতে সুখ দুঃখের গল্প করা যাবে।

তুই খুব চালাক! তোর মোটেই ক্ষিদে পায়নি। আসলে তুই আমাকে খাওয়াতে চাস। ভাল, ভাল, খুব ভাল। আজ তোর পয়সায় খাব।

দোকানে বসে খেতে খেতে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করি অন্যান্যখবর। উনি নানা কথা শোনালেন—অতীতের কথা, যৌবনের কথা, সংগ্রামের কথা, ভালোবাসার কথা। শুধু বিস্ময় আর বিস্ময় অবাক হয়ে শুনি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি, মাষ্টারমশাই, মাসীমা কেমন আছেন?

তা তো বলতে পারবো না বাবা। উনি স্বর্গ কিংবা নরকের কোন এক বিভাগে কর্মরতা আছেন। আমাকে ঠিকানা জানায়নি। —বলেই আমার মুখের দিকে তাকান।

মাসীমা মারা গেছেন?

হ্যাঁ, আমার কষ্ট আর দুঃখ উনি আর সইতে পারলেন না। তাই সুখের আশায় প্রস্থান করলেন—। কথাটা বলেই মাষ্টার-মশাই কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন।

আর আপনার ছেলে?

আমার ছেলে? মানে সৌরভ দাশগুপ্ত? ও এখন জেল খাটছে। দেখতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথেই তোমার সঙ্গে দেখা হল।

আপনার ছেলে জেল খাটছে?

বারে? এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমি স্বাধীনতার জন্য জেল খেটেছি আর আমার ছেলে ঐ স্বাধীনতার মূল্যটুকু বাঁচাবার জন্য জেলে গেল।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কিছু বলতে পারছি না। ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। বুঝতে পেরে মাষ্টারমশাই বললেন, আমার ছেলে সৌরভ হোল কাঁচকাটা হীরে। ইংলিশে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর চাকরীর খোঁজ করতে লাগল। কারণ, সংসার আর চলে না।

বাধা দিয়ে বললাম, আপনি তো পেনশন পান। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য সরকার তো বেশ ভাল ব্যবস্থাই করছেন।

বিস্মিত মাষ্টারমশাই মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে বললেন, বাবা আমি তো সেই তালিকাভুক্ত নই। মানে, কে দেবে আমার সার্টি-ফিকেট? আমার সঙ্গে কোন নেতার দহরম মহরম নেই, টিভি, রেডিও আমার অপেক্ষায় বসে থাকে না। মন্ত্রীরাও আমার দিকে ফিরে তাকায় না। তাই আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ আরো আশ্চর্য হোল আমার ছেলে সৌরভ প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েও ভাল চাকরী পায় নি। প্রতিটি সরকারী পরীক্ষায় সফল হয়েও বিরাট অংকের ঘুষের টাকা দিতে না পারার জন্য চাকরী অধরা রয়ে গেল।

কিন্তু অন্য কাজও তো করতে পারতো?

তা হয়তো পারতো। কিন্তু আমার জন্য ও অতিমাত্রায় চিন্তা করতো। আমার প্রতি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বেইমানী ও সহ্য করতে পারে নি। ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। তাই আমাকে না জানিয়ে এ মুমূর্ষু সংসারটাকে বাঁচানর জন্য ও বাঁকা পথের আশ্রয় নিল।

বাঁকা পথ ?

হ্যাঁ। ছিনতাই আর রাহাজানির পথ। বাসে একজন ভদ্র মহিলার সোনার হার ছিনতাই করে ধরা পড়ে যায়। পুলিশ কেস হাল্কা করতে চায় নি। আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবার জন্য পুলিশ অফিসারের পায়েও ধরেছি। কিন্তু শোনে নি। বিচারে ওর জেল হয়ে গেছে।

মাষ্টারমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করি, মাষ্টারমশাই আপনার ঠিকানা দিন। আপনার কোন কাজে আসতে পারলে··· ।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাস্টারমশাই বললেন, ঠিকানা কোথায়? বাড়ীওয়ালা বলে দিয়েছে, কালই ঘর ছেড়ে দিতে হবে, কারণ চোরেদের বাড়ীতে রাখা চলবে না।

মাষ্টারমশাই। আপনাকে···

আমার মাথায় হাত দিয়ে মাষ্টারমশাই বললেন,

আমার ঠিকানা, ঠিকানাবিহীন
চলার পথ অতীব সুকঠিন
স্বাধীন ভারতে আজ আমি অর্বাচীন
নূতন ঠিকানা সে তো দিশাহীন অন্তহীন
ভাল থেকো, সুখে থেকো, মনে রেখো
আমরা আজও পরাধীন।

আমার লেখালেখি

'অনুরাগে' ২০০১ সালের শারদীয় সংখ্যায় 'আমার লেখালেখি' নামে একটি বিভাগ শুরু হচ্ছে। এই বিশেষ বিভাগে লেখার জন্য অনুরাগ সাহিত্য সভায় যোগাযোগ করবেন।

বিয়োগ থেকে যোগ

হরিভট্ট

(সতেরো)

সুলতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অজিত চলে গেলো, বলে গেল যে কোনো প্রকারে সে সমরেশকে এনে তার কাছে পেঁাছে দেবে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোলো।

প্রথমে সে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলো, সমরেশ কয়েক মাস পূর্বে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে, মনে হয় অন্য কোনও ইউনিভার্সিটীতে ভর্তি হয়ে বাকী পড়াশোনার চেষ্টা করবে। তাই প্রথমেই বর্ধমান ইউনিভার্সিটীতে গিয়ে খোঁজ নিল, কিন্তু সমরেশ সেখানেও ভর্তি হয় নি। অত কাছে গিয়েও সে তার বাড়িতে দেখা করলো না, কেননা হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে রাজী নয়।

সে সকলের অজান্তে বর্ধমান থেকে চলে এলো। ক্রমে ক্রমে একের পর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে শান্তিনিকেতনে বা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়েও খোঁজ করলো কিন্তু নেই, কোথায় গেলো সে ? এতো বড় একটা ভারতবর্ষে কোথায় সে তার খোঁজ করবে ? তবে কি প্রাইভেটেই এম এস, সি, পরীক্ষা দেবে ? কিন্তু প্রাক্‌টীকাল ক্লাসগুলো ম্যানেজ করবে কি করে ?

রোজই সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করে আর বিকালে সুলতাকে পড়াতে গেলে তার ফিরিস্তি শোনাতে হয়। সে ব্যাকুল আগ্রহে জানতে চায় কি হোলো কিছু সন্ধান পেলেন এবং কোথায় কোথায় গেলেন ?

না ঃ ভালো লাগে না, সে আর সুলতার মুখের পানে চাইতে পারে না। এই ভাবেই বৎসর কেটে গিয়ে দুবৎসরে পড়লো, সুলতা ভাল ভাবে বি, এ, পাশ করে "ল" কলেজে ভর্তি হোলো, আর সে তখন তাকে পড়ানো ছেড়ে দিয়ে চলে এলো।

সমরেশের কথা জানতে যায় সুলতা। রোজই তাকে কিছু না কিছু স্তোকবাক্য শোনাতে হয়, যাতে সুলতার মনটা ভালো থাকে।

এই ভাবে আরো কয়েক বৎসর কেটে যায়। সুলতা ভালো ভাবে আইন পাশ করে বাবার কাছে শিক্ষানবিশি করছে ও তার বাবার সঙ্গে কোর্টেও যাচ্ছে। সে এখন এ্যাডভোকেট হয়ে দু একটি করে মামলাও করছে।

ইতি মধ্যে রাধিকারঞ্জন মারা গেলেন। সুভাষিনী দেবী বিধবা হয়ে সংসার থেকে একটু একটু করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঠাকুরঘর নিয়ে পড়লেন। স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে ছেলে বিমলের বিয়ে হোলো। মনে হোল এবার তিনি হয়তো একটু শান্তি পাবেন। কিন্তু হঠাৎ মেয়ে তটিনীর গৃহত্যাগ তাঁকে একেবারেই শয্যাশায়ী করে ফেললো। একটু একটু করে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পঞ্জা লড়তে লাগলেন। শেষে একদিন মেয়েকে না দেখেই পরপারের ডাকে চলে গেলেন।

সব কটি চরিত্রের মধ্যে যার চরিত্রের উপর কোন বিতর্ক নেই, কোন আলোচনা নেই, এখন সেই তটিনীর সম্বন্ধে দু চার কথা না বললে তার উপর অবিচার করা হয়।

সংসারে থেকেও যে নির্বিকার, সব সময় একা একা থেকে সকলের চোখের সামনে থেকেও যেন কত দূরের একজন মেয়ে। নিজ গরিমার কথা কারো কাছে জাহির করার স্বভাব নয়। কিছু মৌন, কিছু ধীর, কিছু সংযত। সব কাজে আছে কিন্তু "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের আর কি।

মনে মনে সে প্রথম দিন থেকেই অজিতকে ভালবেসে এসেছে, কিন্তু সংগোপনে। কোন প্রতিক্রিয়া কেউই জানতে পারেনি। তাই এতদিন পরে। যখন দাদা বিমল সেই অজিতকে বাড়ি থেকে বিদায় করলো, ও তার জন্য অন্য পাত্রের ঠিক করলো, তখনই মনটা তার

বিদ্রোহ করে উঠলো, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার মেয়ে সে নয়। তাই কাউকে কিছু না বলেই নিজের পথ নিজেই বেছে নিল। গৃহত্যাগ করে সে তার মৌন প্রতিবাদ জানিয়ে ভাইয়ের সংসার থেকে বিদায় নিল। কিন্তু যার জন্য তার এই মৌন প্রতি বাদ সেই অজিত কিন্তু মোটে তার মনের কথা জানলো না, কোন দিন কোন কাজেই অজিত বুঝতে পারেনি যে তার জন্যই মনে মনে কেউ তাসের ঘর বানাচ্ছে।

অজিত বুঝেছিল যে রাধিকাবাবু যখন মারা গেছেন তখন তার প্রয়োজনও এ বাড়ী থেকে ফুরিয়ে গেছে। কেননা গিন্নিমা শয্যাশায়ী। এখন সংসার দেখাশোনার ভার ছেলে বিমলের উপর। সে অধ্যাপনা করছে, তার রোজগারের উপর গাড়ী রাখা যদিও চলে, কিন্তু বেশি মাইনে ও খাওয়া দাওয়া দিয়ে কোন ড্রাইভার রাখা সম্ভব নয়। তবুও তার বাপের আমলের লোক বলে বিমল তাকে ছাড়ায় নি। তার উপর সে তটিনীর মাস্টারও বটে, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে কিছু বলেনি।

অজিত একদিন কথাটা তুললো তার কাছে, কি গো প্রফেসর বাবু আর আমার থাকার প্রয়োজন কি? তুমি তো বেশ গাড়ী ড্রাইভ করতে পারো, আর তটিনীও বি, এ, পাশ করে বসে আছে তবে শুধু শুধু আমাকে রেখে লাভ কি?

অজিতদা তুমিও তো, এম, এ, পাশ করেছো, তুমিও ভালো রেজাল্ট করেছো তবুও আমাদের মায়ায় এখানে পড়ে আছো, তুমি ইচ্ছে করলে কি আমার মত প্রফেসারি করতে পারো না?

আহা তোমাদের বাড়ী থেকেই যা পাচ্ছি তাতেই তো বেশ চলে যাচ্ছে, আবার বাড়তি পয়সার প্রয়োজনটা কি? তবু তোমাদের এখানে একটা মাথা গোঁজার স্থান আছে, তাই যাবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

তবে এখনই বা করছো কেন ? বিমল সাগ্রহে প্রশ্ন করলো।

অজিত বললো, না ভাই আর তোমাদের সংসারে থেকে তোমাদের বার্ডেন হতে চাই না, আর আমার তো ঘর বলতে তোমরা, আর সংসার বলতেও তো তোমরা, তাই এতদিন পড়ে ছিলাম, এখন একটু ভারতটা ঘোরার ইচ্ছা আছে। আমার যা হোক করে চলে যাবে, আমার কথা তুমি ভেবোনা। একদিন সে নিজেই স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গেল। মনে হয় সমরেশকেই খুঁজতে।

(আঠেরো)

এর পরই তটিনীর স্বেচ্ছানির্বাসন ও সুভাষিনী দেবীর মৃত্যু, সবই সিনেমার পর্দার মত একটা করে ঘটনা ঘটে গেলো।

মানুষের করার কিছুই নেই, যা ঘটে যাবার ঠিক ঠিক ঘটবেই। কেউ তো তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বিমলের স্ত্রী সুপর্ণার গান ভেসে আসছে। সিনেমার গান। 'মাটির এ খেলা ঘরে কেউ হাসে আর কেউ কাঁদে, ভালোবাসা দিয়ে কেউ বালুচরে বাসা বাঁধে।'

বিমলের স্ত্রীর সুমিষ্ট কণ্ঠ যতই অর্গানের বাজনার সঙ্গে মিশুক না কেন, কিন্তু কথাগুলো ঠিক। সব কথাই সত্য। প্রাণবন্ত। তটিনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠিক রাত ৯ টায় হাওড়া স্টেশনে পেঁছে গেলো রাত সাড়ে নটা নাগাদ। কোথায় যাচ্ছে সে নিজেই জানে না। শুধু টিকিট কাটার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল, এখন কোন ট্রেন ছাড়ছে ? জানলার ওপার থেকে ভেসে এলো ভরাটী গলায় এখন ছাড়ছে দেরাদুন এক্সপ্রেস, ৯।৪৫ মিনিটে ছাড়বে, টিকিট নিয়ে তাড়াতাড়ি যান। ট্রেনে একটু গণ্ডগোল ছিল বলে লেটে ছাড়ছে।

টিকিট নিয়ে একটি পুটুলি সম্বল করে, ছুটলো ট্রেন ধরতে দেখলো একটি ট্রেন ছাড়ার জন্য সিটি বাজাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করায় জানলো হ্যাঁ ওটাই "দেরাদুন এক্সপ্রেস"।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে সামনে যে বগিটা পেলো সেটাতেই উঠে বসলো।

ভিড়ে ঠাসা বগিটার একটা বেঞ্চের এক কোনায় গিয়ে বসে, পুটুলিটা পাশে রেখে হাঁপাতে লাগলো, একটু প্রকৃতিস্থ হতে, লক্ষ্য করলো তার সামনে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তারই পানে চেয়ে আছেন, মনে হলো তিনি বোধ হয় কিছু বলবেন।

তটিনীও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে সস্নেহে তাকে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে মা ?

উল্টে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সে জিজ্ঞাসা করলো, এ ট্রেনটা কোথায় কোথায় দিয়ে যাবে ?

বৃদ্ধের উত্তর সে তো অনেক স্টেশান দিয়েই যাবে। গয়া, কাশীধাম, হরিদ্বার, দেরাদুন গিয়ে আর যাবে না। তুমি কোথায় যাবে মা ?

আমার দেরাদুনের টিকিট। মনে করছি তার আগে কোথাও নেমে পড়বো।

ওঃ বুঝেছি, তুমি হরিদ্বার যাবে ? সে তো দেরাদুনের আগেই পড়বে।

তা হলে সেখানেই নামবো। তটিনী মৃদু স্বরে জবাব দিল।

আমরাও ওই হরিদ্বারে যাচ্ছি মা, তোমার সঙ্গে কই কাউকে তো দেখছি না ? তুমি একাই চলেছো ?

তটিনীর ছোট্ট উত্তর, হ্যাঁ।

খুব ভাল কাজ করনি মা, এখন রাস্তাঘাট খুবই খারাপ, তার

উপর অতো দূরের জার্নি, তোমার বয়েসও কম, কাজটা ভাল করনি মা। সঙ্গে কাউকে নিয়ে এলে পারতে?

দেখুন আমি বি, এ, পাশ নিজেই কি আমি নিজের ভার নিতে পারি না?

আহা, সেটা তো বুঝি, তবু তুমিতো মেয়ে। তাই তোমাদের একজন সহায়ক প্রয়োজন হয়। ঠিক কিনা বলো মা?

কেন? আপনারাই তো রয়েছেন আর গাড়ীর মধ্যে আপনাদের মতই কত শত লোকও তো রয়েছে। কেউ কি দরকারে সাহায্য করবে না? যদি একান্ত প্রয়োজন হয় সকলেই এগিয়ে আসবে। এটাই তো মানুষের ভরসা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মৃদু হেসে বললো, মা তুমি যেটা জানো সবক্ষেত্রে যে সেটা হবে তা কি করে বলবো? যত লোক দেখছো সব লোকই কি ভালো? সবাইকে পরোপকারী বলে ভাবলে ভুল হবে। লজ্জিত ভাবে সুলতা উত্তর দেয়, না না। তা ঠিক নয়, তবে বিপদ হলে কেউ না কেউ সাহায্য করবে না, এটা ভাবাও ঠিক নয়।

হ্যাঁ মা, সব সময় এই দিকটাই ভেবে নিয়ে পথে বেরোতে হয়। বিশেষ করে তোমাদের বয়সী মেয়েদের। তবে আমরা যখন আছি তখন কোনো ভাবনা নেই।

কিছুক্ষণ গাড়ীর জানলায় চেয়ে থাকার পর এক সময় বৃদ্ধ বললেন, মা হাত ধুয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কিছু খেয়ে নাও।

সেইরূপ লজ্জিত স্বরে তটিনী বলে, না না আমি বাড়ী থেকে খেয়েই এসেছি, আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। সত্যই সে বাড়ী থেকে খেয়েই নিয়েছিল। তার ঘরের দিকে বড় কেউই একটা আসতো না। তার খোঁজও কেউ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই রাত ৯ টায় যখন সে চলে আসে তখন কেউ তাকে লক্ষ্যও করেনি।

সে রাত্রিটা কোনক্রমে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। পরের দিন সকাল থেকে সারা দিন রাত্রি যেন আর কাটতে চায় না। এক সময় সে রাত্রিও কোনক্রমে কেটে গেল, এলো ভোর ৬টায় হরিদ্বার। সামনের বৃদ্ধ লোকটা ও তার মনে হয় একটি নাতি বছর ১৬।১৮ বয়েস হবে। বিছানা ও জিনিস পত্র বাঁধা ছাঁদা করছে, দেখে সে মালুম করলো এবারে নিশ্চয় হরিদ্বার এসে গেলো। মাঝের স্টেশানে সে কিনে দুপুরের খাবার নিরামিষ ভাত তরকারী খেয়ে নিয়েছিল, গত রাত্রে বৃদ্ধের অনুরোধে গরম গরম পুরী ও তরকারী খেয়েছে তাই বিশেষ তার কোন কষ্ট হয়নি। সে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলো, হরিদ্বার কি এসে গেলো?

হ্যাঁ গো মা যদি নামো প্রস্তুত হয়ে নাও ঠিক ছটায় হরিদ্বার থামবে।

আমার আবার প্রস্তুতি, তাচ্ছিল্য ভরেই তটিনী জবাব দেয়।

হ্যাঁ মা ঠিকই বলেছো তোমার তো সঙ্গে ওই পুঁটুলিটা ছাড়া আর কিছু নেই, ওটা নিয়ে নেমে পড়লেই হোলো?

এক সময় হরিদ্বার স্টেশনে গাড়ী থামলো। কুলি ও যাত্রীদের ছোটাছুটি ও হাঁক-ডাকের মধ্যেই এক সময় ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও তার নাতি ও এক সধবা বৃদ্ধা মহিলা মনে হয় তার স্ত্রীই হবেন, নেমে পড়লেন ও তাঁদের পিছু পিছু তটিনীও নেমে পড়লো।

কুলিরা মোট লওয়ার জন্য এলো ও টাঙ্গীওয়ালারাও এলো তাঁদের নিয়ে যেতে বিচক্ষণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক কুলির নাম্বার নোট করে মালগুলো গুনে ছেড়ে দিলেন, তাঁর নাতি সঙ্গে সঙ্গে চললো।

এতক্ষণে সেই বৃদ্ধা মহিলা তটিনীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় যাবে মা?

তটিনী পাল্টা প্রশ্ন করলো আপনারা?

মহিলা বললেন, আমরা প্রথমে ভোলাগিরি ধর্মশালা, পরে বাসা ঠিক করে নেবো।

তাহলে আমিও তাই, বলে তটিনী তাঁদের পিছু পিছু চলতে লাগলো।

বাহিরে গিয়ে সবাই দেখলো, সেই নাম্বার নেওয়া কুলিটা একটা টাঙ্গীর কাছেই মাল গুলো নামিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি গিয়ে একটু দরাদরি করে কুলিদের বিদায় করে দিয়ে টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে পড়লেন। মালগুলি টাঙ্গায় চাপিয়ে বৃদ্ধ তটিনীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় উঠবে মা?

তার হয়ে বৃদ্ধা মহিলাই উত্তর দিলেন, ও এখন আমাদের সঙ্গেই ভোলাগিরিতেই যাবে পরে কোথায় যাবে ও দেখে নেবে।

ঠিক ঠিক সবাই তাঁরা ওই টাঙ্গায় গিয়ে উঠলেন। টাঙ্গাটা চলতে চলতে এক সময় ভোলাগিরি ধর্মশালায় থামলো।

বৃদ্ধ আগে গিয়ে ঘর ঠিক করে এলেন। পরে মালগুলো কুলি ডেকে ভিতরে পাঠালেন ও টাঙ্গাওয়ালার টাকা দিয়ে সবাইকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

সামনেই বলাই ট্যাটার্জির হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্থ করলেন অবশ্য তটিনীর খরচা তটিনী নিজেই দিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধেও সে মোটেই তার খাওয়ার খরচা তাঁদের দিতে দিলো না।

বাবা কি একগুঁয়ে মেয়ে, বৃদ্ধ টীপ্পনি কাটলেন।

তটিনী বললো, একে তো গাড়ী থেকেই আপনারা আমার ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছেন, আবার কেন? আর আমি তো অপারগ নই তবে কেন শুধু শুধু আমার খরচা টানবেন, দাদু?

চালাক তটিনী তাকে দাদু বলায় তিনি ও বৃদ্ধা খুবই খুশী হলেন তাঁদের সঙ্গেই সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে সে খরচা দিয়েই ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে আরো দু তিন দিন ঐ ধর্মশালায় কেটে গেলো।

একদিন সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলো, দাদু এখানে কোন জায়গায় স্থায়ী ভাবে আমার একটা কাজ হয় না? যা কাজ হয় হোক আমি গ্রাজুয়েট। অফিসের কাজ থেকে ঝিয়ের কাজ সবই পারবো, মানে "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই" জানেন?

দেখি কি হয়। আজ বিকালে সপ্তর্ষি আশ্রমে বেড়াতে যাবো, ওখানে কথা বলে দেখবো কি হয়। তিনি কিছুক্ষণ তটিনীর মুখের পানে চেয়ে থেকে পরে বললেন, তোমার এই বয়েসে ঘর ছেড়ে এতোদূর এসে কাজ করার প্রয়োজনটা কি দিদি? বিয়ে থা করে সংসারী হলেই তো পারো?

হ্যাঁ, পারি। কিন্তু যার তার সঙ্গে একটা ধরে দিলেই কি বিয়ে করা যায়? আমার একটা ব্যক্তি-সত্ত্বা নেই?

হ্যাঁ দিদি সেতো ঠিকই। আমি বুঝতে পেরেছি দিদি। তোমার মন মত লোক হয়নি তাই বাড়ী থেকে চলে এসেছো। তুমি তাঁদের কাছে বলেছিলে যে তুমি কাকে চাও?

না দাদু বলিনি, তারাও আমার মনের কথা জানে না, আর যারে চাই সেও জানে না যে আমি তাঁকেই চাই।

বাঃ ভারী আশ্চর্য তো, আসামী জানল না কি তার অপরাধ। বৃদ্ধ ঠাট্টা করে বললেন, তুমি খুব চাপা তাই না? তবে এখন আমাদের কাছে এতো খোলাখুলি ভাবে বলছো কেন?

হঠাৎ তটিনী কেঁদে ফেললো। বললো, আমি যাঁকে চাই তিনি আজ আমার নাগালের মধ্যে নেই, দাদু। তাই ঘর ছেড়েছি। এখানে থাকতেই মন চাইছে, তাই স্থায়ী ভাবেই থাকতে চাই।

বৃদ্ধা বললেন, এখানে কি তোমার সেই মন চোরা কৃষ্ণ আসবে ভেবেছো ? তপস্যা করবার জায়গাটা বেছেছো মন্দ নয়, কি বলো ভাই। দেখা যাক কি হয় !

টিপ্পনি কেটে তটিনী বললো, এটাতো তারই দরজা তাই নামটা হরিদ্বার কি বলেন দাদু ? সেও রহস্য করতে জানে।

ঠিক ঠিক, তবে সে আসতে আসতে যদি রাই বৃদ্ধা হয়ে যায় ?

আবার টিপ্পনি, তিনি এসে কুব্জার গায়ে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিলে আবার নবযৌবনা হবো।

হাঃ হাঃ হাঃ করে উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বৃদ্ধ বললেন, সেটা ঠিকই বলেছো দিদি। আচ্ছা আজ বিকালে সপ্তর্ষি আশ্রমে আগে তো চলো, পরে দেখা যাবে।

তখনকার মত কথোপকথন শেষ হোলো, বলাই চ্যাটার্জীর হোটেলে খেয়ে যে যার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো, দুপুরের ভাতঘুম মন্দ নয়।

[ক্রমশ]

মোহনা সাময়িকী

আধ্যাত্মিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা সম্বলিত ষান্মাসিক প্রবন্ধ সংকলন। সম্পাদক : ফাদার শিলিংস, অসিত দাশগুপ্ত।

শান্তিভবন ১/৩২বি, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড কলকাতা-৭০০০২৬, ফোনঃ ৪৬৪-১৩০০

প্রতি সংখ্যা দশ টাকা।

ভ্রমণ বলরাম বসাক

এই যে চলেছে তুষানল পথে জ্বলে যেতে থাকা রেলের কামরা,
নিচে বিদগ্ধ চাকায় ঘুরছে উন্মাদ ঝড়ে মদন ভস্ম।
এই যে অন্ধ গহ্বরে তুক স্বপ্নের ঝোরা ভেঙে ভেঙে পড়ে।
কি এই নিশীথ চাবি হারা ভারি তালা ঝুলে থাকা বন্ধ হোটেল ?

এই যে পাথর ফাটানো শিকড় শিশিরে সবুজ ক্ষণিক পুষ্প,
এই যে পাথর দেবদেবীময় নৃত্যে ছন্দ নিত্য পতন,
এই যে পাথর পথের নিমেষ কত মাইল পরে ঢলে পড়ে যায়।
এ কি সে পাথর যাতে চাপা চিরকুট হয়ে থাকা সারাটা জীবন ?

কোন কোন দিন বদলাতে হয় গাইডকে,
কোন কোন দিন শুনতেই হয় রদবদলের ইতিহাস,
চলতেই হয় ধোঁয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেজা করলার গাড়ি,
মাঝে মাঝে শুয়ে মেরামত, বসে স্বর্গদ্বারের বেনচে।

যত বলি আমি ভালবাসি মানে তোমারই তো রথ দেখি
আর কলা বেচি স্তাবকের কাছে তোমারই।

চাকরি সনৎকুমার মিত্র

স্বপ্নে জাগরণে এ মনে তোমাকে
সেদিনই বেঁধেছি, যে দিন স্বর্ণর
শব্দ ঝংকারে বাঁধলে আমাকে
দেখালে তোমাতে অরূপবর্ণর
রূপের সরোবর, পুষ্প-পর্ণর
শোভাকে ভুলে যাই, তোমাতে মন থাকে।

রাধাপদ্ম মাধুরী সিংহ

পদ্মের নীল কুঁড়ি
একটি একটি পাপড়ি উন্মোচিত হতে হতে
সজ্জিত অলিন্দ থেকে মিলোয় আঁচল
চলে যায় ঋতাবরী ঊষা...
সূর্য ধাবমান অনুবর্তনের ব্যর্থতায়
সঙ্গোপনে ভাঙচুর ছারখার দাহনের বেলা
সারাদিন রাধাপদ্ম সূর্যসাধ আঁকড়ে থাকে
পূব পশ্চিমের টানা প্রতীক্ষা প্রহর
নিষ্ফল স্বপ্নের ছাঁচে নকশা টলে পড়ে।

কলকাতার বই মেলা অর্চিতা রায় চৌধুরী

বই চাই বই
কোথায় বল পাই।
রাখতে ছেলে মেয়ের আবদার,
বাবা-মারা হয় শুধু জেরবার।
যাব কি ময়দান ?
ভেবে ভেবে-তারা হয়রান।
কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের বাজার
বই যায় পাওয়া সেখানে এন্তার।
বেছে বেছে নেওয়া যায় যেটা প্রয়োজন
কাগজ খুলে নেব দেখে বিজ্ঞাপন।
যাই চল। সকলে মিলে বই মেলায়,
বসেছে মেলা ময়দানের ঘেরা জায়গায়।
টিকিট পেলে ঢোকা যায় সেখানে,
পয়সা দিয়ে নেওয়া যায় বই কিনে।
সারাটা দিন বই মেলায় মানুষের আনাগোনা
দেশ বিদেশ থেকে আসে মানুষ করতে বেচাকেনা।
বড়রা ঘুরে বেড়ায় ছোটদের সাথে নিয়ে,
খুশি হয় খাবার খেয়ে আর বই পেয়ে।
কলকাতায় বই-মেলা বসে প্রতি বছর,
ছোট বড় সবাই খুশি এইটিই জোর খবর।

তুমি আছো মঞ্জরী সিংহ

কখনও স্বপ্নের মতো কখনও বৃষ্টির মতো রিমঝিম
তুমি ছুঁয়ে যাও
হাওয়া বয়, পাতা ওড়ে এদিক ওদিক
স্থির অমলিন নির্জনতা
দূর পাহাড়ী পথের বাঁক
তুমি আছো আজও আছো

কাঠের বেড়ার ধারে বিষণ্ণ পপলার
তুমি আছো আজও আছো

পাইনের স্তব্ধ শাখা, পাহাড়চূড়ায় মেঘ
তুমি আছো, আজও আছো

আজ হয়েছে নদী রূপম সাহা রতন

নদীয়া আজ নয়, আজ হয়েছে নদী,
বানের জলে ভেসে গেছে, দুর্গা মায়ের বেদী,
কলোনীতেও আজ নেই, কোন কল-রব,
সর্বনাশা ঘোলা জলে ভেসে গেছে সব।
হাজার গ্রাম-মাঠ, হয়েছে সাগর
ডুবে গেছে বন্যায় নগর-শহর,
ঘর নেই, নেই বাড়ী, আছে আর্তনাদ
এভাবেই কাটছে দিন,
আসছে কালো রাত।

হাসতে ভাল লাগে অভীক গঙ্গোপাধ্যায়

……বিলাসের সায়াহ্নে মৃত্যুর স্তাবকতায়,
শৌখিন, সুন্দর অমরতায়
আমি হাসি।

বিশীর্ণ হাতে অস্ফুট এক পদ্মকে তুলে—
অপ্রস্ফুটিতের এক যন্ত্রণায় রেখে,
চিরস্বপ্নের সুখনীড়ে পালাতে দেখে
আমি হাসি।
পরিত্রাণের আগাম ইঙ্গিতে
কাব্যময়,
অগণিত বিভৎস ক্ষমতাহীন শক্তি
চেতনায় নিজের অধিকার
……শব্দ বুদ্ধির অনির্দেশ্য গতিতে অতিক্রান্ত
নূতন আরম্ভের সীমারেখা পর্যন্ত।

নূতন গানের নূতন সুরের মত
প্রথমবারের সেই হাসি
আত্মপীড়নের মধুর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেনি।
আমি হাসি।
হাসি শুনে সহাস্যে তার স্বীকৃতি জানাই।
অস্তিত্বের সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের
নিরন্ধ্র, অনিশ্চিত, অন্ধকারের মাঝে
জীবনের প্রতি লগ্নেই
আছে সেই হাসি
সেই আমি ছাড়া আমি।

ঘনঘটা সুপতি ঘোষাল

কখনও আলো, কখনও ছায়া
এই পৃথিবীর বুকে।

কখনও হাসি, কখনও কান্না
জীবনের সুখেদুখে!

ছন্দে ভরা নীল আকাশের গায়
রবিকরে রক্তলেখা—

দিনে দিনে কত ছবি এঁকে যায়
নিখিলের রূপরেখা।

স্মৃতিময় অতীতের পিছু টানে
বিস্ময়ে বিভোর মন।

কালের সাগরে বিশ্বচরাচরে
ঘটে কত অঘটন!

রাখীবন্ধন বিশ্বনাথ সাহারায়

মিনু আমার ছোট বোন পড়া শোনায় নেই মন,
শুধু খেলা আর খেলা।

আমাকে বলে দাদা, গায়ে মেখে কাদা,
সকাল সন্ধ্যা বেলা।

যখন যেখানে থাকি সব কাজ ফেলে,
রাখী পূর্ণিমা দিনে ছুটে চলে আসি।

মনে পড়ছে পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

মনে পড়ছে সেই সব দিনের কথা—
যা আর কোনদিন ফিরে আসবে না।
শুধু স্মৃতি হয়ে ভাসবে
মনের দর্পণে মাঝে মাঝে দেখা দেবে।
কত কিছু হারিয়ে গেল জীবন থেকে।
তবু ও চলতে হয় জীবনের পথে
কখনো থেমে যাওয়া তারপর আবার চলা
চোখে পড়বে কত কিছু—থাকবে অভিমান
সুখে-দুঃখে জীবন—ভালোবাসায় ভিজে যাবে মন
তোমাদের কথা মনে পড়বে যেতে যেতে।

বহিঃপ্রকাশ ডাঃ নির্মল তালুকদার

ভগবান আমাদের হাত-পা দিয়েছেন।
অনায়াসে হাত-পা ছুঁড়তে পারি।
কিন্তু সংযত থাকি,
পাছে লোকে পাগল বলবে,
এই ভেবে।

অথচ মনটাকে সংযত না রেখে,
এলোমেলো ছুঁড়ে দিই;
কেননা মন নিরবয়ব।
বহিঃপ্রকাশ নেই।

নিজস্ব কল্পনা আনজু বাপ্পু

আমাকে ঘিরে
এখন এক জাগতিক শব্দ হয়
কখনো রোদ হয় কখনো লৌহ কপাট
কখনো জলের আওয়াজ, অন্তর দগ্ধ আগুন।
কখনো কাঁটা বনে শুয়ে
অজান্তব আকাশে ওড়া
বিন্ধাটবি টবে উড়ে যাওয়া।
মাঝরাতে কল্পনার চোখে শুভরাত্রি লেখা।
নিজস্ব কল্পনা বলে কেউ শত্রু নেই
কেড়ে নেওয়ার মুছে দেওয়ার
যেমন খুশি হাঁটতে পারি ইচ্ছে মতন ছুটতে পারি
সান্ত্বনার সেই বালিশ বুকে
জীবন ভোর হাসতে পারি।
রাত বিরেতে মিঠেল হাওয়া
তবু যেন বুক পুড়ে যায়, কলজে পোড়ায়
কলজে পোড়ায় সেই ধোঁয়াতে
চোখ জ্বলে যায়, শরীর কাঁপে ব্যথায় ব্যথায়।
সে বুঝি ওই ঈশান কোণের পুঁই মাচার ওই
ধারের ঘরে মুখের মাঝে সুখের ফসল
তুলছে ঘরে।
সে বুঝি তাই কাছে পেলে ওইগুলি সব
গল্প শোনায়
দূরে গেলেই অবহেলায়
ভুলে যাওয়ার ন্যাকড়া ছড়ায়
বকুল হাওয়ায়।

নিরালম্বী অনাদি সেন

মনে হয় কোনো চিন্তাই নেই—
নির্লিপ্ততা সব ব্যাপারেই
অথচ রাতটা নিদ্রা বিহীন
উদ্বেগ নিয়ে ঈর্ষায় কাঁপে।

পরশ্রী-কাতর ? তা হলেতো আর
অবলম্বন বলে ধরে রাখবার
কিছু তো থাকতো কিছু তো মিলতো
থাকতো না আর জটিলতা কোনো।

উধাও হাসির শান্ত কবর
কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ঘুমোয়
লক্ষ জোনাকী পাখা ঝাপটায়
কালো দেয়ালের দরজা খুলতে।

লক্ষ জোনাকী পাখা ঝাপটিয়ে
অন্ধকারের দেয়াল ভাঙ্গবে ;
কালো দেয়ালটা অন্ধকারের
প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে চাঁদকে ডাকবে।

মনে হয় বুঝি বিলাসী মনটা
তামসিকতার সঙ্গমে বোবা !
পৃথিবী ঘুমোয়, আমিও ঘুমোই ;
আকাশে তারারা রাত্রি জাগবে।

তোমার তুলনা ওমর আলী

কিসের সাথে তোমার হাসির হয় তুলনা
চাঁদ দুদিনের চেয়ে দেখতে আর ভুলনা
ধান কাউনের লাজুক ঘোমটা না খুলোনা
তোমার কথা দোয়েল কণ্ঠ লাগছে ভালো
কোমল সুরে মোহন বাঁশি কে বাজালো

কিসের মতো তোমার কোমল ঠোঁট দুটি গাল
সদ্য ফোটা পদ্ম যেন হয় না আড়াল
ডাহুক পাখির রঙ পেয়েছে চুল কতোকাল
পুষ্ট তোমার শরীর ভরা মাটির সুবাস
আবার গোলাপ সুগন্ধ দেয় মৃদু বাতাস

কিসের সাথে তোমার চোখের তুলনা হয়
আকাশে দুই তারা তাকায় অনেক সময়
কালো ভ্রমর ফুলের সাথে কি কথা কয়
আগুন ভরা তোমার রূপের আকর্ষণে
পুড়ে মরতে পতঙ্গ হই ব্যাকুল মনে

পাহাড়–নদী স্মরণ দত্ত

দুইজনাতে দাঁড়িয়ে আছে বকুলতলায় চুপ
অফিস ফেরত সন্ধ্যে এমন বৃষ্টি ঝরে টুপ।

গ্রীলের ফাঁকে চেয়ে আছে দুটো প্রভ চোখ
টবের মাথায় জিনিয়া দুটো তৃষিত অমরলোক।

সন্ধ্যেঘাটে নৌকো পাটে বাদাম চিবোয় প্রেম
জোনাক দুটো হেসে বলে অনেক প্রব্লেম।

রজনী গোছা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভোর
মালতী সন্ধ্যা ঘোমটা টেনে শরমে দেয় দোর।

স্কুলবেলায় আড়ালে সুজন করবে বলে ভাব
ব্যাগ সামলে ছুটলে সোনা চলকে ওঠে 'লাভ'।

এমনি কত পাহাড়-নদী লিখছে তাদের ডায়েরী
গালিব-দানিশ শরাব কলম মহাব্বতের শায়েরী।

সার্থক জীবন নিতাই দত্ত

সত্যজিৎ রায়ের নামে, লিখেছিল কবিতা।
বাড়ি গিয়ে শোনালো, লেখাগুলো সব-ই তা ॥

লেখা শুনে শ্রীরায় বলেছিলেন 'বেশ'।
এখনো কাটেনি যে, সে মধুর রেশ ॥

গুণ্টার গ্রাস ভালবেসে, দিলেন 'অটোগ্রাফ'।
সে কারণে মনের গ্লানি হয়ে গেল 'সাফ' ॥

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র দিলেন, নিজ হাতে 'প্রাইজ'।
ক্ষুদ্র হলেও তার কাছে সেটা বিরাট 'সাইজ' ॥

তসলিমা নাসরিণের নামে ছড়া লিখে ধন্য।
শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন, নাসরিণ তার জন্য ॥

নলিনী দাশ কাছে পেলে, করতেন খুব স্নেহ।
যখন ছিলেন পৃথিবীতে, নিয়ে নশ্বর দেহ ॥

কল্যাণী কার্লেকারের কাছে আজীবন ঋণী।
সুস্থ সবল হয়ে যেন বেঁচে থাকেন তিনি ॥

সুধীর চ্যাটার্জী তার সাহিত্যের গুরু।
ওঁর কাছেই লেখক হবার হাতে খড়ি শুরু ॥

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে, সে প্রণাম জানায়।
তাঁর প্রণয়ে মন ভরে কানায় কানায় ॥

সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, শিল্পী ব্রজেন সেন।
ছেলেটিকে তিনি প্রচুর ভালবাসতেন ॥

অভিনেতা প্রশান্তকুমার শুনে তার ছড়া।
বলেছিলেন, তোমার লেখা সত্যি মিঠে কড়া ॥

তরুণকুমার নিজে কেনেন তার লেখা বই।
বলেন, দাদার নামে বই লিখেছ দেখে খুশী হই ॥

অসীমকুমার মিত্র মশাই তার কাছে খুব দামী।
সবার স্নেহে ধন্য যে, সেই ছেলেটাই আমি ॥

হারানো স্মৃতি অমিতাভ কর্মকার

হারানো স্মৃতি মন্হন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
বাউলরা সব গ্রামে গ্রামে,
অসংখ্য বাউল গান গাইছে।
হারানো স্মৃতি ফুলের মত প্রস্ফুটিত প্রথম কুসুম,
অসংখ্য মানুষ, স্মৃতি দর্শন, অনেক আয়না।
যে প্রথম গান গেয়েছিল সেই মানুষটি
নেড়ি কুত্তার চরিত্র আর সেই মানুষটার চরিত্র
সমাজ দর্পণের কাছে এক নয়।
স্মৃতি মন্হন খাতার পাতায় লিখে লিখে
ফেলে আসা জীবনের গ্লানি, তিক্ততা, মনোবেদনা,
অসম্ভব কণ্ট ফুলকে ভালবাসতে শেখেনি
সমাজের নীচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছবার জন্য
আরও এক ধাপ ও এগিয়ে গেল।

মেয়েটির নাম মণিমালা বন্দনা বসু (মিষ্টি)

মণিমালা, ও আমাদের সবার প্রিয় মেয়ে,
মিষ্টি মেয়েটির দিকে সবাই থাকে চেয়ে।
ভাবে সবাই, এমন সুন্দর ফুলটি কোথা থেকে এলো,
নিশ্চয় কোন দেবতা, নিজের হাতে গড়ে ওকে পাঠিয়ে দিলো,
নৃত্য, গীত ও নানা গুণে সে পারদর্শিনী,
তার হাসিতে ঝরে মণি, মুক্তা, পান্না ও চুণী।
লক্ষ্মী মেয়ের মত সারা বাড়ি করে আছে আলো,
সবাই বলে-মণিমালা, মেয়েটি ভীষণ ভালো।
গরীব দুঃখী সবাইকে সে আপন করে নেয়,
বড়রা তাই দুহাত ভরে ওকে খেলনা কিনে দেয়।
সবাইকে সে খেলনাপত্র বিলিয়ে আনন্দ পায়,
ছোট বড় প্রত্যেকে তাই মণিমালাকে চায়।
চার ভাই-এর সে ভীষণ আদরের ভগিনী,
এই ভাইদের সে-ই একমাত্র খেলার সঙ্গিনী।
ছোট্ট এই মেয়েটি যখন বড় হবে,
সারা বিশ্বে তার নাম সর্বাগ্রে রবে।

পুস্তক পরিচয়

পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য

ডঃ অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় জি. এ. ই, পাবলিশার্স, ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, ফ্ল্যাট-১১, কলিকাতা-৬, ত্রিশ টাকা।

ভারতে প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারটি (১) শ্রী। আচার্য রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। (২) রুদ্র। আচার্য বিষ্ণুস্বামী—বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। (৩) মাধ্ব। আচার্য মধ্ব—দ্বৈতবাদ। (৪) সন। আচার্য নিম্বার্ক—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। সনক—সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার, ব্রহ্মার এই চার মানসপুত্রের নামে 'সন' সম্প্রদায় চার ভাগে বিভক্ত। নিম্বার্ক এই চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সম্পর্ক 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব বিষয়ে রামানুজাচার্যের সঙ্গে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতবিরোধ। বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও মত-পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য সবসম্প্রদায়েরই মূল ধারণা একটি—ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে। ভাগবতের এই শ্লোকাংশের মধ্যেই নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম (শঙ্করাচার্য), অন্তর্যামী পরমাত্মা (সাংখ্যযোগ) এবং ষড়ৈশ্বর্যময় সগুণ ভগবান—এই তিন রূপ প্রকটিত হয়েছে।

খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্বভারতে—আসাম, গৌড়বঙ্গ ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ও ঐ সম্পর্কের সাহিত্য বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

মধ্যযুগে ভারতের লক্ষণীয় বিষয়—ধর্মচেতনা। এর মাধ্যমেই সেকালের সাধু-সন্ত, কবি-দার্শনিকদের চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের উৎস-সন্ধানে বেদান্তসূত্রে পৌঁছতে হয়। বৈষ্ণবধর্ম হচ্ছে ভাগবতধর্ম, ভগবান সম্পর্কিত ধর্ম, ভক্তিধর্ম। এই ধর্মের উপাস্য হলেন কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, রামচন্দ্র। এঁরা কখনো স্বতন্ত্র, কখনো কৃষ্ণের একত্বে উপনীত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। ভক্তিস্রোতে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ সম্মিলিত হয়েছিল।

ঐ দুই শত বৎসর ধরে পূর্বভারতের বৈষ্ণব আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন আসামে শঙ্করদেব, বঙ্গে চৈতন্যদেব, উড়িষ্যায় পঞ্চসখা। এই আন্দোলনের

পরিচয় পওয়া যায় সেকালে রচিত অনুবাদ, পদাবলী ও জীবনচরিত জাতীয় সাহিত্যকর্মের মধ্যে। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক তত্ত্ব পূর্বভারতের বৈষ্ণবধর্মের মূল ভিত্তিরূপে পরিগৃহীত হয়েছে। গৌড়ীয় দর্শনের মত এমন সর্বাতিশায়ী দর্শন আসাম, উড়িষ্যা কিংবা অন্য কোথাও রচিত হয় নি। এই দার্শনিক ভাবনা থেকেই এসেছে ভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ কর্ম, পদাবলী সাহিত্য এবং মহাপুরুষবর্গের জীবনচরিতাদি।

এই ভক্তিধর্ম ভাগবত পুরানের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা, কীর্তন দ্বারা ধর্মপ্রচার ও ভক্তিমার্গ-সাধনা ইত্যাদি হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের সাধারণ বিষয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পূর্বাঞ্চলে এবং সমগ্র ভারতে ধর্মের রূপ কেমন ছিল সে বিষয়েও লেখিকা যথেষ্ট উপাদান পরিবেশন করেছেন।

লেখিকা এই গ্রন্থে আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, বঙ্গদেশ উড়িষ্যা ইত্যাদি অঞ্চলের নাম জাতি ও ভাষা, রাজনৈতিক ইতিহাস ১৫-১৬ শতাব্দীর পূর্বকালের ধর্মীয় পরিমণ্ডল, মহাপুরুষদের আবির্ভাব, ভক্তবৃন্দের রচিত পদাবলী, জীবনী-সাহিত্য, তাঁদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইত্যাদি অনুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছেন।

সমসাময়িক কালে পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব সংস্কৃতি আন্দোলনে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে সারা ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশেই শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক মতবাদ যে প্রাধান্য পেয়েছে তারও উল্লেখ করেছেন প্রতিভাময়ী সুলেখিকা ডঃ শ্রীমতী অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৪ সালের পি, এইচ, ডি, গবেষণা কর্ম। গ্রন্থের ভাষা বিষয়োপযোগী এবং অতি সুন্দর। লেখিকা এই সানন্দ পরিশ্রমী কাজের জন্য আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী।

লেখিকা এই গ্রন্থে সংক্ষেপে পূর্বভারতের বৈষ্ণব সংস্কৃতি আন্দোলনের একটি পরিপূর্ণ পরিচয় লিপিবন্ধ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য কত বিস্তৃত ও বিশাল রূপ ধারণ করেছিল পূর্বাঞ্চলে, কত শত শত গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল তারও একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। পঞ্চভূত গ্রন্থে 'মনুষ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি

নিহিত রহিয়াছে।' আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কেও লেখিকার ভালবাসা রয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আজ যে দেশি-বিদেশি ভাষায় দেশি-বিদেশি পণ্ডিতবর্গ শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক তত্ত্বাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করছেন এবং সর্বত্র সাধারণ পাঠকের মধ্যেও এবিষয়ে জানবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার কারণ স্বরূপ এই জাতীয় গ্রন্থরচনাও অন্যতম বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের এই বিশেষ শাখাটি খুবই আগ্রহ সঞ্চার করেছে। কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণসাহিত্য, কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভাবনা—নামে পৃথিবীময় এর অনুসন্ধান চলছে! অনেকে উৎসাহ নিয়ে এই কাজে ব্রতী হয়ে ভারতেও আসছেন।

শ্রীমতী অনুরাধার এই গ্রন্থটির পরিচয়পত্র লিখে আমরা এক ঢিলে অনেক গুলো পাখি মারবার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে,—কলকাতা পুস্তক মেলা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং নারী-ব্যক্তিত্বের প্রশস্তি।

শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গল্প অনুষ্ঠান

৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির জীবনানন্দ হলে একটি গল্প পাঠের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে 'গল্পের কাগজ' নামের একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উদ্যোগে। গল্প পাঠ করলেন রমানাথ রায়, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শেখর বসু, বলরাম বসাক, সুব্রত নিয়োগী, রবিশঙ্কর বল, সুজিত হালদার, কিন্নর রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির পরিচালক ছিলেন দেবব্রত মল্লিক ও অর্ধেন্দু চক্রবর্তী।

ক্যাসেট পরিচিতি শ্রীমতী শিখা গোস্বামী

'গৌরলীলা-কীর্তন-সম্রাট', 'কীর্তন-সুধাকর' শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তন জগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্মস্থান নবদ্বীপ, তবে বেলেঘাটার বর্তমান বাসিন্দা এই সঙ্গীত শিল্পীর চাহিদা আজ বাংলার ঘরে ঘরে। 'বিথোভেন' (Bithoven) রেকর্ড কোম্পানি তাঁর গাওয়া গৌরলীলা ও ব্রজলীলার প্রায় বিশটি পালাগানের ক্যাসেট তৈরি করেছেন ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তা সমগ্র রাজ্যের গ্রাম-নগর-জনপদে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রতিটি ক্যাসেটের মূল্য ৩৫ টাকা।

গত ১২ই নভেম্বর, ২০০০ মহাজাতি সদনে এই শিল্পীকে নিয়ে একটি একক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এর আয়োজক ছিলেন বিথোভেন কোম্পানি ও সহযোগিতায় ছিলেন 'আপ্রেম রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টার'। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত পাঁজা, শ্রীক্ষিতি গোস্বামী, পরিচালক শ্রীগৌতম ঘোষ, মনীষী অম্লান দত্ত, শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রণবেশ সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

'আপ্রেম্ রিসার্চ সেন্টারের কর্ণধার, প্রয়োগকলা সমালোচক শ্রীদীপঙ্কর মজুমদার আমাকে গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গানের ক্যাসেট উপহার দেন—'বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ' পালা। এ ছাড়া শিল্পী নিজে আমাকে তাঁর গানের চারটি ক্যাসেট উপহার দিয়েছেন। এ গুলি হল 'জন্মাষ্টমী, 'রামলীলা', 'চাঁদকাজী উদ্ধার' ও 'রূপ সনাতন মিলন' পালা। এগুলি আমি বারবার শুনেছি। এছাড়া নবদ্বীপে বসে তাঁর গান সামনাসামনিও শুনেছি। যেটা আমার মনে হয়, তা হলো যে রেকর্ড কোম্পানির কাছে তিনি এক মূল্যবান হীরক বিশেষ। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনে আছে নাটকীয়তা, যা শোনার চেয়েও দেখার আনন্দকে মাতিয়ে তোলে বেশী। কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য, সংলাপ, আখর ইত্যাদি যোগে তিনি আসর জমিয়ে তুলতে দক্ষ কারিগর। এক কথায় তাঁর গাইবার পদ্ধতি অভিনব। তবে কণ্ঠস্বরের বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তাও আছে বলে আমার মনে হয়, যার কিছুটা অভাব লক্ষণীয়। সহশিল্পী শ্রীমতী ছায়া দাসের কণ্ঠ পরিণত ও সাবলীল বলা যেতে পারে।

আজকে কীর্তনের প্রায় অবলুপ্তির যুগে দাঁড়িয়ে, যেখানে নন্দকিশোর, পঞ্চানন দাস, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবীরা চলে গেছেন সেখানে তাঁর ব্যস্ত জীবনের কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকার্য। বাংলা গানের অবহেলিত এই প্রাচীন ধারাকে রক্ষা করবার যে গুরু দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, তাতে একজন বাঙালী হয়ে আমি তাঁর কাছে ঋণী বলে মনে করি।

শোক সংবাদ

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অনন্য নান্দনিক'-এর সম্পাদক এবং পরিচালক অমলকান্তি দলুই গত ৮ ডিসেম্বর ২০০০ সাল শুক্রবার অকালে পরলোক গমন করেছেন। এই কর্মযোগী উৎসাহী সাহিত্যসেবকের অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদকমণ্ডলী, অনুরাগ।

Learn E-commerce from
ASSET INTERNATIONAL
with IBM Certification.

The Special Feature of the Course :

* IBM & ASSET Joint Certification.
* 100% assured Placement.
* Quality Training with IBM books.
* Leeds to other two international Certifications like :—
  MCSE (Microsoft Certified System Engineer)
  Sun Java Certification.

For, any classification Please Contact the Centre at the following address :

CA-38, SECTOR-1. SALT LAKE CITY. Calcutta-700 064.
Dial : 358-5949/7479.
E-mail : sdssol @ vsul. com

* Come with a Copy of Anuraag and get a Fabulous offer.

ASSET International

Recharging Careers

Edited and Published by Sm. Dhira Bhattacharya M. A., from 34/2, Mahim Haldar Street, Calcutta-700 026